কৃষিখাতে কৃষকের নিয়ন্ত্রণ

ও

আমাদের খাদ্যে সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব)

কৃষিখাতে কৃষকের নিয়ন্ত্রণ ও আমাদের খাদ্য সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন

Questions of farmers'control in agricutlrue and our food sovereignty

Translated by: Lucky Akter

Edited by: Md. Saidur Rahman

Published in: December 2017

Published by: Research Initiatives, Bangladesh (RIB)
House 54 (3 A), Road 11, Block F
Banani, Dhaka - 1213, Bangladesh
Phone : +880-2 55042345-6
Web : www.rib-bangladesh.org

Supported by: Rosa Luxemburg Stiftung
Franz-Mehring-Platz 1
10243 Berlin, Germany
Web: www.rosalux-southasia.org

Design & Print: The Reflector
Mukto Bangla Shopping Complex
8th Floor, Mirpur-1, Dhaka, Bangladesh

"Sponsored by the Rosa Luxemburg Foundation e.V. with funds of the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany."

"Gefördert durch die Rosa-Luxemburg-Stiftung e.V. aus Mitteln des Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland"

The contents of this booklet can be freely reproduced and quoted on the condition that the source be mentioned. Research Initiatives, Bangladesh (RIB) would appreciate receiving a copy of the text in which the report is mentioned of cited.

সূচিপত্র

ভূমিকাঃ

অধিবেশন ১: উদ্বোধন ও মূল প্রবন্ধ পাঠ

মূল প্রবন্ধ: প্রকৃতিকে পুঁজিতে রূপান্তর: ক্লাইমেট-স্মার্ট কৃষির ধাঁধাঁ, মূল্যবোধ ও রাজনীতি

অধিবেশন ২: জীববৈচিত্র্য, জলবায়ু পরিবর্তন এবং সিএসএ'র প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের কৃষি

প্রবন্ধ: জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে বাংলাদেশের নীতির সমালোচনামূলক পর্যালোচনা

প্রবন্ধ: জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষি প্রযুক্তি: উপকূলীয় অঞ্চলের জন্যে বারি'র তত্ত্ব ও ব্যবহার

প্রবন্ধ: নদী ক্ষয় ও সামাজিক আন্দোলন

অধিবেশন ৩: জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কর্মসূচি এবং কৃষিক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ

প্রবন্ধ: জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষি: ব্যবহার ও ভবিষ্যত

প্রবন্ধ: ভারতের প্রেক্ষিতে জলবায়ু সহিষ্ণু, কৃষিপ্রতিবেশ ও সামাজিকভাবে স্থায়ী কৃষি: নীতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, এবং প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জ

প্রবন্ধ: বাংলাদেশের ধানের বৈচিত্র্যের নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

অধিবেশন ৪: ক্লাইমেট স্মার্ট কৃষি (প্রভাব) এবং বিকল্পসমূহ

প্রবন্ধ: বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম নারী কৃষক এবং তাদের প্রতিবেশনির্ভর কৃষি চর্চা

প্রবন্ধ: টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবনযাত্রার জন্য কৃষক এবং জেলেদের সাথে নিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা: ভোলা দ্বীপে কোস্ট-এর অভিজ্ঞতা এবং প্রচেষ্টা

প্রবন্ধ: প্রকৃত জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষি কার্বন মার্কেট থেকে আলাদা হবে, কেন্দ্রিয়ভাবে শিল্পনির্ভর সমাধান থেকে সরে আসুন, এবং স্থানীয় সমাধান ও নিয়ন্ত্রণের পথ খুলে দিন

অধিবেশন ৫: ক্লাইমেট স্মার্ট কৃষি (প্রভাব) এবং বিকল্পসমূহ

প্রবন্ধ: বর্তমান প্রশ্নের জবাবে প্রথাগত জ্ঞান ও পদ্ধতির অনুসন্ধান

প্রবন্ধ: বাংলাদেশে জৈবকৃষি: অবস্থা, ইস্যু ও সম্ভাবনা

প্রবন্ধ: সিএসএ'র কার্যকর বিকল্প

অধিবেশন ৬: বিকল্প কৃষি আন্দোলন ও চর্চাসমূহ

প্রবন্ধ: প্রতিবেশগত কৃষিতে যেতে কৃষকেরা আগ্রহী তো: রিইব'র বিশেষ কর্মসূচির অভিজ্ঞতা

প্রবন্ধ: নেপালের কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব: কৃষকদের কৃষি পৃথিবীকে শীলত করে: নেপালী কৃষকদের চোখে

প্যানেল আলোচনা: কৃষিতে বিদ্যমান সমস্যা ও কৃষির ভবিষ্যত রূপ

অধিবেশন ৭: সমাপনী

প্রবন্ধ ও আলোচনার সারমর্ম

বিশেষ ও প্রধান অতিথিদের মন্তব্য

উপসংহার

সংক্ষেপণ

এডব্লিউডি	অল্টারনেট ওয়েটিং অ্যান্ড ড্রাইং
বিএডিসি	বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন
বিএআরসি	বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ কাউন্সিল
বারি	বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট
বিএইউ	বিজনেস অ্যাজ ইউজুয়াল
বিসিসিএসএপি	বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান
বিনা	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার এগ্রিকালচার
ব্রি	বাংলাদেশ রাইচ রিসার্চ ইনস্টিটিউট
বিডব্লিউডিবি	বাংলাদেশ ওয়াটার ডেভলপমেন্ট বোর্ড
সিসিআরএফ	ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্ট ফান্ড
সিসিটিএফ	ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড
সিডিএম	ক্লিন ডেভলপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট
সিএফসি	ক্লোরোফ্লোরো কার্বন
সিআরডব্লিউ	ক্রপ ওয়াইল্ড রিলেটিভ
সিএসএ	ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার
ইএপি	ইকোলজিক্যাল এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম
জিসিএফ	গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড
জিএইচজি	গ্রিনহাউজ গ্যাস
জিওবি	গভার্নমেন্ট অব বাংলাদেশ
এইচভিসি	হাই ভ্যালু ক্রপ
আইএনডিসি	ইনটেনডেড ন্যাশনালি ডিটারমিন্ড কন্ট্রিবিউশন
আইপিসিসি	ইন্টারগভার্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ
আইপিআর	ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি রাইটস্
ইরি	ইন্টারন্যাশনাল রাইচ রিসার্চ ইনস্টিটিউট
এমএসিএইচ	ম্যানেজমেন্ট অব অ্যাকুয়াটিক ইকোসিস্টেমস্ থ্রু কমিউনিটি হাজবেন্ডরি
এমডিটিএফ	মাল্টি ডোনার ট্রাস্ট ফান্ড
এমওএ	মিনিস্ট্রি অব এগ্রিকালচার
এমওএলএফ	মিনিস্ট্রি অব ফিশারিজ অ্যান্ড লাইভস্টক
এনএএমএ	ন্যাশনালি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মিটিগেশন অ্যাকশন
এনএপিএ	ন্যাশনাল অ্যাডাপটেশন প্রোগ্রাম ফর অ্যাকশন
এনপিকে	নাইট্রোজেন- ফসফরাস-পটাসিয়াম
ওএ	অর্গানিক এগ্রিকালচার/জৈব কৃষি
পিএ	প্যারিস এগ্রিমেন্ট
পিপিসিআর	পাইলট প্রোগ্রাম ফর ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স
আরইডিডি	রিডিউসিং ইমিশনস্ ফ্রম ডিফরেস্টেশন অ্যান্ড ফরেস্ট ডিগ্রেডেশন
ইউডিপি	ইউরিয়া ডিপ প্লেসমেন্ট
ইউএসজি	ইউরিয়া সুপার গ্র্যানুয়ুল
ডব্লিউএআরপিও	ওয়াটার রিসোর্সেস প্ল্যানিং অর্গানাইজেশন
ইউএনএফসিসিসি	ইউনাইটেড নেশনস্ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ

মুখবন্ধঃ

আমাদের কৃষক হাজার বছর ধরে জমিতে শ্রম দিয়ে নানা ধরনের খাদ্যশস্য উৎপাদন করে আসছেন, আর যাবতীয় প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা করে দক্ষ ফসল উৎপাদন ও বীজ সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন। কৃষকরাই আমাদের টিকে থাকার জন্যে ও আমাদের ভবিষ্যত সুরক্ষার জন্যে পরিশ্রম করে যান। তারা অবিরাম গতিতে রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে অক্লান্তভাবে কাজ করে যান। অথচ, দিন বা মাস শেষে তাদের উপার্জন নিয়ে অনিশ্চয়তা থেকেই যায়।

এতসব সত্ত্বেও প্রায়শই কৃষকের জ্ঞান ও দূরদর্শিতার কদর করা হয় না। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে তাদের ঐতিহ্যগত জ্ঞান ও উৎপাদন ব্যবস্থার বিপরীতে অধিক উৎপাদনযোগ্য কৃষি পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে। তবে সেসব তথাকথিত বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সাময়িকভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও কৃষি প্রতিবেশ যারপরনাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে- পানি দূষিত হয়েছে, মাটি নষ্ট হয়েছে, এবং খাদ্যে বিষক্রিয়া দেখা দিয়েছে। সবুজ বিপ্লবের পথ ধরে শস্য উৎপাদন বেড়েছে বটে, কিন্তু বিপ্লব ঘটাতে গিয়ে কৃষি ক্ষতিকর রাসায়নিক সার ও বিষ নির্ভর হয়ে পড়েছে। যদিও বলা হয়েছিল, সবুজ বিপ্লব পৃথিবীর ক্ষুধার্ত মানুষের খাদ্যের যোগান দেবে, কিন্তু কার্যত একতরফাভাবে উৎপাদন বেড়েছে। তাতে, মানবিক সমস্যার সমাধানের বিপরীতে ব্যবসাব্যবস্থা শক্তিশালী হয়েছে। পৃথিবীতে খাদ্যের উৎপাদন বাড়লেও ক্ষুধা-অপুষ্টি কমেনি। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক নানাভাবে অবহেলিত হয়েছে। জলবায়ুর পরিবর্তন কৃষিকে যখন নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করছে, তখন দেখা গেছে, এই পরিবর্তনের সূত্র ধ'রে বিভিন্ন শক্তিশালী মহল কৃষি ও প্রকৃতিকে ঘিরে নতুন নতুন ব্যবসায়ের পরিকল্পনা করছে। জলবায়ুর পরিবর্তনে উন্নত বিশ্বের শিল্পকারখানা থেকে উদ্গত গ্রিনহাউজ গ্যাস বিশেষভাবে দায়ী। অথচ, তার খেসারত দিতে হচ্ছে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রকে। সবুজ বিপ্লবের দায় কাটিয়ে ওঠার আগেই জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার, অর্থাৎ জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষি তথা সিএসএ'র তত্ত্ব দিয়েছে। আর এই তত্ত্বের প্রচার ও বাস্তবায়নে বিশ্বব্যাংকসহ পৃথিবীর বিভিন্ন কর্পোরেট শক্তি, কোম্পানি ও কর্পোরেট-সাহায্যপুষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠান কাজ শুরু করেছে। কৃষি ক্ষেত্রে ক্লাইমেট স্মার্ট বা জলবায়ু সহিষ্ণু হতে কারোরই আপত্তি থাকার কথা না, তবে সিএসএ'র স্বরূপকী হবে, এর পেছনে কারা ভূমিকা নিচ্ছে, উন্নয়নশীল সমাজ সেটাকে কীভাবে নেবে, প্রভৃতি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চিন্তাভাবনা, আলোচনা-সমালোচনা ও গবেষণা হওয়া দরকার।

আমরা জানি, মানুষের জীবনধারণ প্রতিবেশ ব্যবস্থা তথা জীববৈচিত্র্য, জলাধার, ও বনাঞ্চল প্রভৃতির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। হাজারো প্রকার প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ক বিদ্যমান। প্রতিবেশ ব্যবস্থার কোন একটা স্তরে আকস্মিক পরিবর্তন দেখা দিলেতার প্রভাব কতটা সুদূরপ্রসারী হবে সেটা সহজে নিরূপণ করা যায়না। শত শত বছর ধরে কৃষকরা, বিশেষ করে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র খামারীরা খাবারের যোগানের জন্যে চাষাবাদ করে আসছেন। প্রতিবেশ ব্যবস্থার নিরীখে তারা ফসল ও ফসলের জাত নির্বাচন, চাষপদ্ধতি, সেচপদ্ধতি, ফসল উত্তোলন, বীজসংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেছেন, এবং নানান উপায়ে তারা আকস্মিক দুর্যোগও মোকাবেলা করে আসছেন। পরিবর্তিত জলবায়ুর প্রেক্ষিতে কৃষি ব্যবস্থাকে উপযুক্ত ও শক্তিশালী রাখতে সরকার, গবেষক ও কৃষকদের সমন্বিতভাবে কাজ করা দরকার। এক্ষেত্রে স্থানীয় থেকে বৈশ্বিক, সর্বস্তরে জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষিব্যবস্থা গড়ে তোলাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। যদিও জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও ফসলী জমির পরিমাণ কমে যাওয়ার কারণে অধিক ফসল উৎপাদন যুগের চাহিদা হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার, অধিক ফসল উৎপাদন করতে গিয়ে এমন কোন ব্যবস্থা নেওয়া ঠিক হবে না, যাতে প্রতিবেশ ব্যবস্থা তথা প্রকৃতির ভারসাম্য হুমকির মধ্যে পড়ে এবং প্রকারান্তরে মানুষের জীবনধারণও অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেই সাথে, কৃষির নিয়ন্ত্রণ যাতে উৎপাদক কৃষকের হাতেই থাকে, সে ব্যাপারে আমাদের তৎপর থাকতে হবে।

ড. শামসুল বারি
চেয়ারম্যান, রিইব

ভূমিকা:

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব উন্নয়নশীল দেশের কৃষিতে অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি দেখা দিচ্ছে, কারণ এখানকার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা আবহাওয়ার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করেন। বাস্তবতা হচ্ছে, জলবায়ুর পরিবর্তনে উন্নত বিশ্বের শিল্পকারখানা থেকে উদ্গাত গ্রিনহাউজ গ্যাস বিশেষভাবে দায়ী। অথচ, তার খেসারত দিতে হচ্ছে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রকে। কৃষি ও পরিবেশ বিজ্ঞানীরা অব্যাহতভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন যে, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক নির্ভর কৃষি-বিপ্লব বা সবুজ-বিপ্লব কৃষি ও পরিবেশের ক্ষেত্রে সমূহ ক্ষতি সাধন করেছে। আমরা এর দায় কাটিয়ে ওঠার আগেই এফএও আবার ক্লাইমেট স্মার্ট কৃষি তথা সিএসএ'র তত্ত্ব দিয়েছে। আর বিশ্বব্যাংকসহ পৃথিবীর বিভিন্ন কর্পোরেট শক্তি, কোম্পানি ও কর্পোরেট সাহায্যপুষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিতর্কিত এই সিএসএ'র প্রসারে কাজ শুরু করেছে। বাস্তবতা মেনে কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে, এই ক্লাইমেট স্মার্ট কৃষি'র স্বরূপ কী হবে, এর পেছনে কারা ভূমিকা নেবে, উন্নয়নশীল সমাজ সেটাকে কীভাবে নেবে, প্রভৃতি নিয়ে বিশদ চিন্তাভাবনা, আলোচনা-সমালোচনা ও গবেষণা হওয়া দরকার।

দেখা যাচ্ছে, কেবল জনসংখ্যার বৃদ্ধিই একমাত্র কারণ নয়, বরং উন্নত বিশ্বের ভোগবাদের চাপেও অল্প সময়ে ও ক্ষুদ্র পরিসরে অধিক ফসল উৎপাদন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আর এই অধিক উৎপাদনের দায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তথাকথিত উন্নয়নশীল ও অনুন্নত সমাজের কাঁধে চাপছে। এটি করতে গিয়ে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হয়েছে। এর ফলে পরিবেশ কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তার হিসেব কষা হয়নি কিংবা ক্ষতির হিসেব কষলেও সেটা প্রকাশ করা হয়নি। একথা সত্যি যে, জ্ঞানচর্চা, গবেষণা এবং নীতি নির্ধারণও একটা আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে হয়ে থাকে, যেখানে বিভিন্ন গোষ্ঠীর স্বার্থচিন্তা ও বাণিজ্য জড়িত থাকে। দেখা যায়, একটা সময়ের স্বল্পমেয়াদী পরিবর্তনের রূপরেখা কিংবা কার্যপদ্ধতি ভবিষ্যতে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে; এবং সেটা উল্টো ফলও দিতে পারে। কৃষিতে সবুজ বিপ্লবও এমনই একটা ঘটনা বলে প্রতীয়মান হয়েছে, যার ফলে প্রতিবেশ নষ্ট হয়েছে। জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষির অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে প্রতিবেশগত কৃষি। আমরা জানি, মানুষের জীবনধারণ প্রতিবেশ ব্যবস্থা তথা জীববৈচিত্র্য, জলাধার, ও বনাঞ্চল প্রভৃতির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। হাজারো প্রকার প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ক বিদ্যমান। প্রতিবেশ ব্যবস্থার কোন একটা স্তরে আকস্মিক পরিবর্তন দেখা দিলে তার প্রভাব কতটা সুদূরপ্রসারী হবে সেটা সহজে নিরূপণ করা যায় না। শত শত বছর ধরে কৃষকরা, বিশেষ করে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র খামারীরা খাবারের যোগানের জন্যে চাষাবাদ করে আসছে। প্রতিবেশ ব্যবস্থার নিরীখে তারা ফসল ও ফসলের জাত নির্বাচন, চাষপদ্ধতি, সেচপদ্ধতি, ফসল উত্তোলন, বীজ সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেছে, এবং নানান উপায়ে তারা আকস্মিক দুর্যোগও মোকাবেলা করে আসছে। অথচ, জলবায়ু পরিবর্তনের এই যুগে তাদের অভিজ্ঞতার যথাযথ মূল্যায়ন করা হচ্ছে না। অন্যদিকে বাণিজ্যিক চিন্তা ও কর্মকাণ্ডের জগতে কৃষি ও প্রকৃতি প্রায়শই পণ্য হিসেবে গণ্য হচ্ছে। জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও ফসলী জমির পরিমাণ কমে যাওয়ার কারণে অধিক ফসল উৎপাদন যুগের চাহিদা হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু অধিক ফসল উৎপাদন করতে গিয়ে এমন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, যাতে প্রতিবেশ ব্যবস্থা তথা প্রকৃতির ভারসাম্য হুমকির মধ্যে পড়েছে, এবং প্রকারান্তরে মানুষের জীবনধারণও অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

এই প্রেক্ষিতে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্‌, বাংলাদেশ (রিইব), গত ৯ থেকে ১১ আগস্ট ২০১৭ তারিখে ঢাকায় তিন দিনব্যাপী "ব্যাণিজ্যিকীকরণ ও ভ্রান্ত সমাধান: জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষি ও বিকল্পসমূহ" বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে। রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং-জার্মানি'র সহযোগিতায় আয়োজিত এ সম্মেলনের লক্ষ্য ছিল, কৃষি, কৃষক ও প্রকৃতিকে নিয়ে চিন্তা ও কাজ এবং কাজের মাধ্যমে লব্ধ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বিনিময় করা যাতে গবেষণা, চিন্তা ও অভিজ্ঞতার আলোকে কৃষি ও কৃষকের জন্যে ভারসাম্যপূর্ণ নীতি প্রণয়ন করা যায়। উক্ত সম্মেলনে ভারত, নেপাল ও বাংলাদেশ থেকে প্রথিতযশা বিজ্ঞানী ও গবেষক উপস্থিত ছিলেন।

অধিবেশন ১ঃ উদ্বোধন ও মূল প্রবন্ধ পাঠ

শুরুতেই রিইব এর নির্বাহী পরিচালক ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা রিইব-কে পরিচয় করিয়ে দেন এবং রোজা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং (আরএলএস) এর সাথে রিইব এর সম্পর্ক কী তা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, রিইব এমন একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান যারা নিছক প্রথাগত গবেষণাতেই সীমাবদ্ধ না থেকে অ্যাকশন রিসার্চে জড়িত। নৃ-তাত্ত্বিক, লৈঙ্গিক, পেশাগত ইত্যাদি বিবেচনায় যেসব প্রান্তিক জনগোষ্ঠী রয়েছে তাদের নিয়ে রিইব কাজ করে থাকে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তাদের বিদ্যমান সংকট থেকে উত্তোরণের উপায় অন্বেষণের একটি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে যেখানে রিইব কারিগরি ও গবেষণা সংক্রান্ত সহায়তা দেয়। প্রান্তিক কৃষক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে আরএলএস এর সাথে রিইব'র কাজের পূর্বঅভিজ্ঞতাই এই সম্মেলন আয়োজনে উৎসাহ জুগিয়েছে।

প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন রিইব'র চেয়ারপার্সন ড. শামসুল বারি। এ সম্মেলন আয়োজনের লক্ষ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, বাণিজ্যিকীকরণ প্রক্রিয়া জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক কৃষকরা প্রতিনিয়ত তাদের সম্পদ, উৎপাদিত পণ্য, উৎপাদন ব্যবস্থা, যোগান, প্রযুক্তি, বিপণন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাজার ও ভোগবাদের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। বস্তুত, তারা উৎপাদন পদ্ধতি, যোগান, ও পণ্যের উপর তাদের কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলছে। আর এর প্রভাব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করতে হলে আমাদেরকে সমাজ, বিশেষ করে কৃষক সমাজকে নিবিড়ভাবে জানতে হবে।

মূল প্রবন্ধঃ প্রকৃতিকে পুঁজিতে রূপান্তরঃ ক্লাইমেট-স্মার্ট কৃষির ধাঁধাঁ, মূল্যবোধ ও রাজনীতি

(ক্যাপিটালাইজিং নেচারঃ কাইমেরাস, ভ্যালুস অ্যান্ড পলিটিক্স ইন ক্লাইমেট-স্মার্ট এগ্রিকালচার)

- সৌমিত্র ঘোষ, স্বাধীন গবেষক, সমাজকর্মী, এবং তথ্যচিত্র নির্মাতা

মূলকথাঃ

জলবায়ু পরিবর্তনের ঘটনাপ্রবাহ থেকে এটা অনুমেয় যে প্রকৃতি উজাড় করে সম্পদ আহরণ ইতোমধ্যেই বিপদসীমা অতিক্রম

সৌমিত্র ঘোষ

করেছে এবং তা অনন্তকাল চলা সম্ভব নয়। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্যানেলের মতে, পৃথিবীর তাপমাত্র যদি গত বিংশ শতকের চেয়ে ২ ডিগ্রি বা ততোধিক বৃদ্ধি পায়, তবে ক্রান্তীয় ও শীতপ্রধান উভয় অঞ্চলেই প্রধান শস্যসমূহের উৎপাদন ব্যাহত হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ইতোমধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে গম ও ভূট্টার উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার প্রমাণ মিলেছে। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ক্রপ ওয়াইল্ড রিলেটিভস (সিডব্লিউআর- ফসলের সাথে জন্ম নেওয়া অন্য উদ্ভিদ) অন্যতম সহায়ক হতে পারে, কারণ এদের জিন পরিবেশগত নেতিবাচক উপাদান মোকাবেলায় সক্ষম। অধিক অভিযোজনে সক্ষম শস্যের চাষ বৃদ্ধি করতে হবে। আগামী ১০-১৫ বছরের মধ্যে কৃষকদেরকে যে ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে তা মাথায় রেখে বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ শস্যের নতুন নতুন জাত উৎপাদনে মনোযোগী হতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও খাদ্য সংকটের বিতর্কে জিনের সংরক্ষণ এবং সরবরাহের বিষয়টি ইতোমধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এদিকে বর্তমান শস্যগুলোকে আবারো বাণিজ্যিক পণ্যে রূপান্তরের মাধ্যমে নতুন জেনেটিক সংরক্ষণাগার রাষ্ট্র এবং কর্পোরেশনের হাতে চলে যেতে পারে, এবং সেগুলো জনগোষ্ঠীর নাগালের বাইরে যাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। আইপিআর (ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি রাইটস) এর মাধ্যমে কোন প্রতিষ্ঠান প্রথাগত জ্ঞানের মালিকানা অর্জন করেও জ্ঞানকে কুক্ষিগত করতে পারে।

এফএও'র গবেষণার যুক্তি হচ্ছে, কৃষিতে জলবায়ু ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সিএসএ কার্যকর উপায়ের সন্ধান দিতে পারে। ঝুঁকি হ্রাসের উদ্দেশ্যে যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, বাজার-নির্ভর সমাধানসমূহ যেমন, বিভিন্ন ধরনের বীমা এবং নতুন ধরনের (আপদ) প্রতিরোধী বীজ, সেচ, আগাম সতর্কতা প্রচারের উন্নততর ব্যবস্থা, উন্নততর কৃষির চর্চা, এবং কোনো ফি কিংবা কিস্তির বিনিময়ে অন্যের কাছে ঝুঁকি হস্তান্তর করা। ক্ষুদ্রঋণ সংস্থার সাথে কাজ করছে এমন প্রাইভেট বীমা কোম্পানি বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় আফ্রিকা, এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে ক্ষুদ্র পরিসরে আবহাওয়া বীমা জনপ্রিয় করতে কাজ করে যাচ্ছে।

সিএসএ'র অর্থায়নের সম্ভাব্য উৎস হিসেবে কার্বন মার্কেটের দিকে নজর দিচ্ছে এফএও। বাস্তবায়নের পথে নানান প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমনের উপর একটা মূল্যারোপ এবং সনদ বিক্রির মধ্যে দিয়ে একটি জলবায়ু অর্থায়নের প্রক্রিয়া চলছে।

মাটিতে কার্বন মজুদ এবং এর পরিমাপের ব্যাপারে অনিশ্চিয়তা সত্ত্বেও কার্বন বিপণনের সমর্থকরা নানান প্রকল্প নিয়ে অতিউৎসাহী। কৃষিখাতে জলবায়ু অর্থায়নে প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে 'দা কেনিয়া এগ্রিকালচারাল কার্বন প্রজেক্ট' একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

বন উজাড়করণ ও অপচয় থেকে উদ্ভূত নির্গমন হ্রাস (রিডিউসিং ইমিশনস্ ফ্রম ডিফরেস্টেশন অ্যান্ড ফরেস্ট ডিগ্রেডেশন (আরইডিডি)) এর মত প্রণোদনামূলক প্রকল্পের আড়ালে জনগোষ্ঠীকে ধোঁকা দেয়া হয় এবং তাদের প্রতিদিনকার জীবনকে বাধাগ্রস্ত করা হয়। ইকুয়েডরে ডাচ কোম্পানি ফেইস পরিচালিত একটি বৃক্ষরোপন প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে কার্বন চুক্তির শর্ত মোতাবেক বন্য আগুনে পুড়ে যায় এমন গাছগুলো পুনরায় লাগানো হয়। ঐ প্রকল্পের অধীনে মনোকালচার বৃক্ষরোপন পদ্ধতিতে পাইন গাছ লাগানো হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, ঐ অঞ্চলটি পাইনের জন্য মোটেও উপযুক্ত ছিল না এবং সেখানে অগ্নিকাণ্ডের সম্ভাবনাও অনেক বেশি ছিল। আগুন লেগে গাছগুলো একাধিকবার পুড়ে যায়, এবং সেখানকার জনগোষ্ঠীকেই পুনরায় বৃক্ষরোপনের অর্থের যোগান দিতে হয়। এটাই ছিল কোম্পানির শর্ত যা মানতে তারা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উপর চাপ দেয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের তথাকথিত সমাধানগুলোতে বাস্তবতার চেয়ে অলীক কল্পনাই বেশি। এর বিরাজনীতিক সাঙ্গপাঙ্গদের কাজ হল তাদের কর্মকান্ডের মধ্যে দিয়ে সম্ভাব্য পরাভবতার সকল চিহ্ন আড়াল করে রাখা। বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ, তেজস্ক্রিয়তা, ও বিকিরণ রোধ করা ছাড়া যে জলবায়ু পরিবর্তনের সমাধান অসম্ভব তা এরা বেমালুম চেপে যায়। এ সত্যগুলো প্রকাশিত হলে সিএসএ'র জারিজুরি ফাঁস হয়ে যাবে এবং এফএও, বিশ্বব্যাংক ও ইউএনএফসিসি সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো সজ্ঞানে এবিষয়ে নিরবিচ্ছিন্ন নিরবতা পালন করে আসছে। পাশাপাশি আমরা এও জানি যে, সিএসএ'র জন্য বেসরকারি অর্থায়ন কতোটা অপরিহার্য। স্বেচ্ছাসেবী কার্বন বাজার, যা এখনো বৃহদাকৃতি লাভ না করলেও ক্রমবর্ধিষ্ণু; আর সিএসএ বেসরকারি অর্থায়নের একটা ভাল রাস্তা।

সিএসএ'কে একটা রাজনৈতিক কাঠামোতে দাঁড় করানো দরকার, এবং সেই সাথে যেসব প্রতিষ্ঠান জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক সমাধান প্যাকেজ প্রদান করছে তাদের উদ্দেশ্য ফাঁস করা দরকার। প্রশ্ন থেকে যায়, আদৌ কি মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগের ক্ষেত্রে সিএসএ'র কোনো ভবিষ্যত আছে? যদি বেসরকারি অনুদানের উপরই এর সকল পদক্ষেপ নির্ভর করে থাকে, তবে এর ভবিষ্যত নিয়ে সন্দিহান হওয়ার যথেষ্ট অবকাশ থেকে যায়। জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার জনগোষ্ঠীর কল্যাণে কিংবা তেজস্ক্রিয়তা বিকিরণ হ্রাসে কোনো সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে সিএসএ'কে দেখা যায় না। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে কৃষির একটা নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত বাণিজ্যের বিবেচনায় সংকট সমাধানের পথটি এড়িয়ে যাওয়া হয়। আসলে রাজনীতিকে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। সহনশীলতা,

বীজের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, জীবিকার বৈচিত্র্য এবং কৃষিপ্রতিবেশ ব্যবস্থার সংরক্ষণের সাথে সাথে নিম্নোক্ত বিষগুলোর উপর গুরুত্বারোপ করেছেন ড. ঘোষঃ

- সঠিক সমাধান বের করতে জলবায়ু পরিবর্তনের মুল উৎসগুলো খুঁজে বের করা।
- সিনথেটিক সারের ব্যবহার হ্রাসের পাশাপাশি এন্টারিক ফার্মেন্টেশন ও সংশ্লিষ্ট মিথেন নির্গমণ নিয়ন্ত্রণে কৌশল নির্ধারণ।
- সিএসএ'তে উল্লেখিত তিনটি ক্ষেত্রে সত্যিকার জয় আনতে হবেঃ শস্যের উৎপাদন পদ্ধতি হতে হবে জলবায়ু সহনশীল, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে, প্রশমন নীতি গ্রহণ করতে হবে।
- যেকোনো জলবায়ু পরিবর্তনে উচ্চ অভিযোজনক্ষম নতুন নতুন জাতের শস্য সৃষ্টি করতে হবে।
- পুরো কৃষি ব্যবস্থাকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির সাথে যুক্ত করতে হবে।

প্রবন্ধের ওপর আলোচনাঃ

সরাসরি কোনো সমাধান বা প্রভাব সৃষ্টির পথে না গিয়ে মধ্য পন্থা অবলম্বনের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এম এম আকাশ, যিনি নির্ধারিত আলোচক হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন। তাঁর মতে, প্রথমে উচিত পরিবেশগত সংকটগুলোর উৎস অনুসন্ধান করা এবং তারপর সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পর দায়িত্ব বন্টন করা। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য তিনি মূলত দায়ী করেছেন পুঁজিবাদী উন্নত দেশগুলোকে এবং সেইসাথে ভোগের পরিমাণ কমিয়ে ভোগের একটি চূড়ান্ত সীমা নির্ধারণের পরামর্শ দেন যে সীমা কোনোভাবে অতিক্রম করা যাবে না। তাঁর মতে কার্বন নি:সরণ কখনোই পুরোপুরি বন্ধ করা যাবে না, কেবল এর মাত্রা হ্রাস করা সম্ভব। তাই তার সুপারিশ হচ্ছে প্রযুক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে একটি কৃষকবান্ধব বাজার সৃষ্টি করা। একইভাবে, তিনি জিএমও বীজ ব্যবহার না করে বন্যা, খরা ও লবণাক্ততা সহনশীল বীজ ব্যবহারের পরামর্শ দেন।

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. সেকান্দার আলী মূল প্রবন্ধের সুপারিশসমূহের সাথে একমত পোষণ করে বলেন, "এ পরিস্থিতি মোকাবেলার মূলমন্ত্র হতে হবে শতভাগ রাসায়নিক বিরোধিতা। এখানে চাষাবাদের একপাক্ষিক এবং বদ্ধমূল ধারনা থেকে মুক্তি পেতে উদার আমলাদের প্রয়োজন।" কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রজেক্ট ডিরেক্টর ড. আবু ওয়ালি রাগিব হাসান উন্নততর খাদ্য উৎপাদনের জন্য ক্ষেত্র ও প্রেক্ষাপট নির্ভর সম্প্রসারণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তাঁর মতে, এক্ষেত্রে কার্বন ট্রেডিং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, বরং পরিবেশ রক্ষায় উৎপাদন ও প্রাকৃতিক সংরক্ষণ কৌশল অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। প্রশমন নিয়ে কাজ করার চেয়ে অলটারনেট ওয়েটিং অ্যান্ড ড্রাইং পদ্ধতি অবলম্বন করে ল্যাগিউমিনাস শস্যের আবাদ ও ভাসমান বাগান বেশি গুরুত্ববহ। আসন্ন সংকটের কথা বিবেচনা করে তিনি উৎপাদন ও নানা জাতের বীজের উপর গবেষণায় জোর দেন।

কোলকাতার সেন্টার ফর ইন্টারডিসিপ্লিনারি স্টাডিজ এর চেয়ারপার্সন ড. দেবল দেব, তাঁর পূর্ববর্তী বক্তাদের আলোচনার রেশ ধরে একটি সমন্বিত সুপারিশ পেশ করেন। তাঁর মতে, "আমাদের তিনটি সংকট হচ্ছে - জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য নষ্ট হওয়া, জলবায়ু পরিবর্তন, এবং নাইট্রোজেন চক্র নষ্ট হওয়া। যেহেতু আমাদের এমন কোনো প্রযুক্তি নেই যা দিয়ে আমরা এ সমস্যা মোকাবেলা করতে

অধ্যাপক এমএম আকাশ

অধ্যাপক ড. সেকান্দার আলী

ড. আবু ওয়ালি রাগিব হাসান

আনসার আলি

ড. দেবল দেব

ড. মো. খুরশিদ আলম

ফেরদৌস রহমান

ড. মো. সাইফুল্লাহ

পারি, তাই আমাদের উচিত এর সাথে অভিযোজনের উপায় বের করা এবং খাদ্য উৎপাদনে আমাদের কৃষি পদ্ধতিকেও বদলে ফেলা।" তিনি আরও মনে করেন যে, অভিযোজনের স্বার্থে বীজ ছড়িয়ে দেওয়ার সাথে সাথে সরকারি তদারকি জোরদার করতে হবে।

বগুড়ার কৃষক আনসার আলি তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে বলেন, "জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ফসলহানীর দায় সরকারকে নিতে হবে। কৃষকদের মূল্যায়ন করতে হবে এবং তাদেরকে নীতিনির্ধারিণী পর্যায়ে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। অন্যান্য কৃষি সম্পদের সাথে সাথে মাটিকেও গুরুত্ব দিতে হবে।"

নির্ধারিত আলোচকদের বক্তব্যের পর উন্মুক্ত আলোচনায় বাংলাদের কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) গবেষক ড. মো. খুরশিদ আলম বলেন, "কেবল অভিযোজনের মধ্যে দিয়ে কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রভাব হ্রাস সম্ভব নয়। আমাদেরকে অভিযোজনের সাথে সাথে প্রশমনের সঠিক নীতি অবলম্বন করতে হবে, কারণ কার্বন নির্গমনের হার দিন দিন বেড়েই চলেছে।" বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা ফেরদৌস রহমান তাঁর আলোচনায় গ্রিনহাউজ ইফেক্টের উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং সিএফসি গ্যাস নির্গমন নিয়ন্ত্রণে বৈশ্বিক পর্যায়ে নীতিনির্ধারণে সুপারিশ করেন। কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় তাঁর পরামর্শ হচ্ছে খরা ও লবণাক্ততা সহনশীল বীজ ব্যবহার করা, ও কীটনাশক ব্যবহার হ্রাস করা। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ (বিএআরসি) এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্ত ড. মো. সাইফুল্লাহ মনে করেন, নীতি নির্ধারণে রাজনীতিবিদদের যুক্ত করা উচিত। ভারতের বীজ বাঁচাও আন্দোলনের বিজু নেগি'র পরামর্শ হচ্ছে মিথেন গ্যাসের উৎপাদনের স্বার্থে হালচাষে গরু-মহিষ ব্যবহার করতে হবে। তিনি আরও বলেন "পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার আগে কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কী তা বুঝতে হবে।"

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডভোকেট শামসুল হক রেজা, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ কৃষক লীগ। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শগুলোকে জাতীয় নীতির মধ্যে একীভূত করার ক্ষীণ সম্ভাবনার বিষয়

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর

বিজু নেগি

অ্যাডভোকেট শামসুল হক রেজা

কাজী সাজ্জাদ জহির চন্দন

ভেবে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সরকারের সাথে বাস্তবিক অর্থে ভাল যোগাযোগ তৈরির উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন, যেহেতু কৃষকদের সাথে বিভিন্ন সেক্টরের বিশেষজ্ঞরা জড়িত, তাই তাদের মতামতও উপেক্ষা করা যাবে না। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও ফলাফলে উন্নতি করতে হলে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক পরিকল্পনার উপর জোর দেন তিনি। বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক কাজী সাজ্জাদ জহির চন্দন। তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোকে দায়ী করেন এবং পুঁজিবাদ কখনোই জলবায়ু পরিবর্তনের সমাধান দেখাতে পারে না বলে মন্তব্য করেন। মুনাফার জন্য ককটেল কীটনাশক ব্যবহার করে এমন বহুজাতিক কোম্পানির কার্যক্রম তদারকের জন্য তিনি সরকারের প্রতি দাবি জানান। সঠিক নীতি নির্ধারণের সাথে সাথে বলিষ্ঠ সরাকারি কাঠামোর উপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে উৎপাদনের সাথে একীভূত করতে হবে এবং এর মধ্য দিয়ে কৃষকদের সাথে একটি সেতুবন্ধন রচনা করতে হবে। আরএলএস এর প্রকল্প ব্যাবস্থাপক বিনোদ কোস্টি বর্তমান অবস্থাকে 'চরম বৈশ্বিক অসমতা' আখ্যা দিয়ে কিছু প্রস্তাবনা হাজির করেন। তাঁর মতে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অসমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন কৃষি উৎপাদনকে বাধাগ্রস্ত করে বিধায় কৃষক সরাসরি ভুক্তভোগী হচ্ছে, তাদের আয় কমে যাচ্ছে। এজন্য তিনি জ্ঞানের অভাবকে দায়ী করেন এবং এর ফলে আগামী প্রজন্ম অনেক বেশি ভুক্তভোগী হবে। তার মতে, "কৃষিতে অসমতা এমন একটি অন্যায় যাতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের জন্য দায়ীরা এর থেকে লাভবান হচ্ছে আর যারা নিরপরাধ তারাই ভুক্তভোগী হচ্ছে।"

সম্পূরক আলোচনা পর্বে মূল প্রবন্ধের উপস্থাপক কার্বন ট্রেডিং এর প্রভাব প্রতিরোধে টেকসই উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণের চেয়ে একটি বলিষ্ঠ আশু পদক্ষেপের উপর জোর দেন। তিনি আরও বলেন, পুঁজিবাদি বাজার ব্যবস্থায় অসমতা অপরিবর্তিত থাকবে, এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সমাধানে ভূমিকা রাখবে না। তাই বীজের বাজার নিয়ন্ত্রণ, বাজার ব্যবস্থাপনা এবং তার উপর গবেষণায় জোর দিতে হবে। কারণ, সরকার এ ব্যাপারে ঠিকভাবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ। উদ্বোধনী অধিবেশনের প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী এবং সেন্টার ফর সোশ্যাল স্টাডিজ, ঢাকা এর পরিচালক অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের সমাধানে রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা এবং নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে কৃষকদের অন্তর্ভুক্তির উপর গুরুত্বারোপ করেন। যেহেতু একমাত্র সরকারই এসব সুপারিশ বাস্তবায়নে সক্ষম তাই তিনি এ বিষয়ে সরকারের অবস্থান জানার উপর জোর দেন।

অধিবেশন ২: জীববৈচিত্র্য, জলবায়ু পরিবর্তন এবং সিএসএ'র প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের কৃষি

প্রবন্ধঃ জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে বাংলাদেশের নীতির সমালোচনামূলক পর্যালোচনা

(এ ক্রিটিক্যাল রিভিউ অব বাংলাদেশ পলিসিজ অন ক্লাইমেট চেঞ্জ)

- মোঃ রিয়াজউদ্দিন, প্রাক্তন পরিচালক, পরিবেশ বিভাগ এবং জাতীয় পরিবেশ বিশেষজ্ঞ, এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)

মূলকথা:

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ যে কিনা বিশ্বের মাত্র ০.৩৫% কার্বন নিঃসরণের জন্য দায়ী। জলবায়ু প্রতিরোধের জন্য বাংলাদেশ দুই স্তরের কৌশল গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের কাজের মূল লক্ষ্য হচ্ছে জলবায়ুর পরিবর্তন ইতোমধ্যে মানুষের জীবনে যেসব বিরূপ প্রভাব ফেলেছে এবং ভবিষ্যতে ফেলবে, সেগুলো মোকাবেলায় টেকসই উন্নয়ন করা। উদাহরণস্বরূপ তীব্র তাপমাত্রা, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, বন্যা, খরা, ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়, সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি, সামুদ্রিক স্রোত, জোয়ারের ঢেউ, লবণাক্ত পানির প্রবেশ, সামুদ্রিক অম্লিকরণ ইত্যাদি বাংলাদেশের লক্ষাধিক মানুষের জীবনে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। এসব পরিবর্তন গত ৩০ বছরে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ধারা ব্যাহত করেছে; এমনকি ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকেও বিপন্ন করে তুলছে।

মো: রিয়াজউদ্দিন

তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ সর্বনিম্ন কার্বন নিঃসরণ এবং টেকসই উন্নয়ন এর জন্য কাজ করছে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করার জন্যে প্রশমন এবং খাপ খাওয়ানো- দুই পন্থাই বেছে নিয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারের মোট ৩৮টি পদক্ষেপের মধ্যে ৮টি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো: ১. গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা, ২. কৃষি, মৎস্য, পশুপালন, ৩. স্বাস্থ্য, ৪. জলবায়ু টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ, ৫. বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা, ৬. জীবিকা, ৭. জীববৈচিত্র্য, এবং ৮. নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি। দারিদ্র্য এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকে অভীষ্ট লক্ষ্য ধরে স্থানীয় সম্প্রদায়ের টিকে থাকার সক্ষমতা বাড়িয়ে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্রাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান (বিসিসিএসএপি) তৈরি করেছে। এর লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র দূর করা, কর্মসংস্থান বাড়ানো, খাদ্য নিরাপত্তা, বিদ্যুতের সুবিধা দেওয়া, দেশের সকল নাগরিকের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিধা দেওয়া, টেকসই জলবায়ু ও নিম্ন কার্বন নিঃসরণ, বালি কর্মসূচি বাস্তবায়ন, বিনিয়োগের জন্য প্রযুক্তি এবং অর্থের যোগান, পরিবেশ বান্ধব খাদ্য, বিদ্যুত, পানি, পশুপাখি পালন, এবং স্বাস্থ্য সেবা ইত্যাদির নিশ্চয়তা।

বিসিসিএসএপি'র কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য জন্য ২টি ফান্ড গঠন করা হয়েছে: ১. বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ), ও ২. ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড (সিসিআরএফ)। বাংলাদেশের প্রতীজ্ঞা হলো, গ্রিনহাউজ গ্যাসের নির্গমন কমানো। ইতোমধ্যে ৩০ লক্ষ সৌরশক্তি প্যানেল দেশের নানা প্রান্তে স্থাপন করে বাংলাদেশ পুরা বিশ্বে প্রশংসা অর্জন করেছে। বিদ্যুত সাশ্রয়ের জন্য সরকার আগের বাল্বের পরিবর্তে প্রায় ৩০ মিলিয়ন বিদ্যুত সাশ্রয়ী এলইডি বাল্ব সরবরাহ করেছে। ইট তৈরির ক্ষেত্রেও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে, যা দেশের বায়ু দূষণের হার কমিয়েছে। সরকার যানবাহনের ক্ষেত্রেও মেট্রোরেল, পানি পথ ইত্যাদি উন্নয়নে কাজ করছে, যেগুলোর বাস্তবায়নে বড় আকারের সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগের প্রয়োজন। সরকার বনজ সম্পদ সংরক্ষণের জন্য কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে, এবং ইতোমধ্যে সুন্দরবনেও কার্বনের পরিমাণ নির্ণয় করেছে।

উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, কেন্দ্রীয়ভাবে সরকারি পর্যায়ে ও সরকারি কর্মচারিদের ক্ষেত্রে জলবায়ুর প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবের দরুণ জলবায়ুর প্রভাব প্রতিরোধের প্রাতিষ্ঠানিক চেষ্টা ব্যাহত হচ্ছে। পর্যাপ্ত তহবিলের অভাবেও কার্বন নিঃসরণ কমানো এবং খাপ খাওয়ানো যাচ্ছে না। কারিগরি শিক্ষা ও উন্নত কার্যকর প্রযুক্তিরও অভাব রয়েছে। পরীক্ষা নিরিক্ষার অভাবের দরুণ বাংলাদেশ উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুবিধাগুলা নিতে পারছে না।

প্রবন্ধঃ জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষি প্রযুক্তিঃ উপকূলীয় অঞ্চলের জন্যে বারি'র তত্ত্ব ও ব্যবহার

(ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার টেকনোলজিঃ থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিসেস অব বারি ফর কোস্টাল রিজিওন)

- ড. মো. মোস্তফা কামাল, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), বাংলাদেশ

মূলকথা:
সম্প্রতি জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহতা স্পষ্টত হয়েছে, যা পুরো কৃষির উৎপাদনশীলতার জন্য একটা সংকেত। খরা, বন্যা, লবনাক্ততা, তাপ, ঠান্ডা, জোয়ার মুষলধারে বৃষ্টিপাত, ভূমিধ্বস ইত্যাদি জলবায়ু

ড. মো. মোস্তফা কামাল

পরিবর্তনের নিয়ামকগুলো নেতিবাচকভাবে কৃষিজ উৎপাদনের উপর প্রভাব ফেলেছে। এরপরেও গবেষণা, নতুনত্ব, দেশীয় জ্ঞান ইত্যাদি কিছু কিছু ক্ষেত্রে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করেছে। সরকারের নীতি, উন্নয়ন গোষ্ঠীর সহযোগিতা, কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জলবায়ু প্রতিরোধে প্রযুক্তি, বিকল্প পন্থা ইত্যাদি জলবায়ু প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের কৃষি কাজ অব্যাহত রাখার জন্য সাহায্য করেছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিকূল এবং অনুকূল পরিবেশে চাষাবাদ করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল সবচেয়ে বেশি খরাপ্রবণ অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, পানি সম্পদ অব্যবস্থাপনা, স্বল্প বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, পর্যাপ্ত সেচব্যস্থার অভাব ইত্যাদি খরার কারণ হিসেবে পরিচিত। উত্তর-পশ্চিম ও মধ্যাঞ্চলের প্রায় ২.৫ মিলিয়ন হেক্টর এলাকা খরাপীড়িত। জৈব ব্যবস্থা, খড়ের জাগ, সেচন, বাঁধ ব্যবস্থার মাধ্যমে খরা প্রশমন সম্ভব। শুকনো মৌসুমে সেচের উৎস হিসেবে বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য পুকুর খনন করা যায় যা ভূগর্ভস্থ পানির উপর চাপ কমাবে। এটা অনুমান করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে ২০২৫ সালের মধ্যে ১৫-২০ মিলিয়ন হেক্টর সেচযোগ্য ধানের জমিতে পানির অভাব পড়বে। খরা সহন এবং খরা দূরীকরণ- খরা প্রশমনের দু'টি উপায়। ব্রি ধান ৫৬, ব্রি ধান ৬৬ এবং ব্রি ধান ৭১ খরা সহনশীল।

দেশের প্রায় ৩২ শতাংশ জুড়ে রয়েছে উপকূলীয় অঞ্চল যেখানে দেশের ৩০ শতাংশ লোকের বসতি। এই অঞ্চল জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ঝুঁকির ক্ষেত্রে অন্যতম। নভেম্বরে আগেই বীজ ছিটিয়ে ডিসেম্বরে সেচযোগ্য ধান গাছ রোপন করতে পারলে তা এপ্রিল ও মে'র লবণাক্ততা থেকে অব্যাহতি পায়। ভালো শীতকালীন ফলন পেতে চাইলে নভেম্বরেই বীজ ছিটানো বা বীজগাছ রোপন করা উচিত। শীত ও শুষ্ক

মৌসুমের শস্য টমেটো, আলু, মিষ্টি কুমড়া, তরমুজ, পেঁয়াজ, রসুন, তেঁতুল, মরিচ খড়ের জাগ দিয়ে চাষ করা যায়। খাদ্য শস্য চাষ কিংবা ধইঞ্চা ও খেসারির মতো শস্য চাষ করে লবণাক্ততা কমানো যায়। আউশ ধান চাষ করে পানিশূন্য মৌসুমে জমির লবণাক্ততা রোধ করা যায়। ব্রি জলবায়ু সহনশীল জাত বিআর ১০, বিআর ২৩, ব্রি ধান ৪০, ৪১, ৫৩, ৫৪, ৭৩, ৭৮ উদ্ভাবন করেছে যা শুষ্ক ও লবণাক্ত পরিবেশের জন্য উপযুক্ত। এদের অধিকাংশেরই বায়ু ধরে রাখার সক্ষমতা রয়েছে এবং ৫-৬.৫ টন পার হেক্টর ফলন ক্ষমতাও আছে। সেই সাথে বর্ষা মৌসুমে একত্রে ধান ও মাছ চাষ করা যায়। অন্যদিকে ব্রি ধান ৭৩ উঁচু ভূমির জন্য সম্ভাবনাময় জাত, যেখানে শীতই শস্য উৎপাদনের সর্বোত্তম সময়, এবং এ জাতের ধানের ফলন সম্ভাবনা ৪.৫- ৫ টন পার হেক্টর, স্বল্পবৃদ্ধি সময় এবং সরু শস্যগাছ। ব্রি ধান ৭৮ প্লাবন ও লবণাক্ত জলবায়ু সহনশীল জাত যা জোয়ার ভাটায় প্লাবিত এলাকার জন্য উপযুক্ত। ব্রি ধান ৪৭, ব্রি ধান ৬১, ৬৭ শুষ্ক মৌসুমের জন্য উপযুক্ত। ব্রি ধান ৪৭ কে লবণাক্ত পরিবেশেও নেওয়া যায়। ব্রি ধান ৬৭ লবণাক্ততা সহনশীল এবং সরু জাত যার ফলন হেক্টর প্রতি ৬.৫ টন।

সাম্প্রতিক সময়ে প্রচুর বন্যা হচ্ছে যা নিয়মিতভাবে নিজ গতিপথে বিভিন্ন এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এই বন্যার প্রকারগুলো হচ্ছে- পাহাড়ি ঢল, বৃষ্টি মৌসুমের বন্যা, ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা, মেঘনার মতো নদী তীরে স্বাভাবিক প্লাবন এবং অতিবৃষ্টিজনিত বন্যা। ব্রি ও বিনা প্লাবনসহনশীল ব্রি ধান ২২, ৪৬, ৫১, ৫২, ৭৯ এবং বিনা ১৭ উদ্ভাবন করেছে। সেপ্টেম্বরের শেষ এবং অক্টোবরের শুষ্ক মৌসুমে ধান উৎপাদনের সময় বন্যা প্রচুর ক্ষতি করে, এবং কোন জাতের ধানই ফলন ঘটাতে পারেনা। এ পরিস্থিতিতে কৃষকদের উচিৎ পানি সরে যাওয়ার সাথে সাথেই কলাই চাষ অথবা শীতকালীন শস্য ভূট্টা বা গমের জন্য অপেক্ষা করা। ব্রি ধান ৫৫ লম্বা সরু জাতের ধান যা উচ্চমাত্রার পীড়নসহনশীল। ব্রি ধান ৬৫ সরাসরি রোপিত খরাসহনশীল ৯৫ দিনের আউশ জাত যাতে সামান্য সেচ প্রয়োজন এবং যা উচ্চ আগাছারোধী। ব্রি আরো কিছু ওষুধী গুণসম্পন্ন জাত উদ্ভাবন করেছে। ব্রি ধান ৩১ একটি শুষ্ক মৌসুমের জাত যা স্নায়ুরোগ প্রতিরোধী। বিআর ৫ জারনরোধী জাত যা রোগ প্রতিরোধ করে। বিআর ১৬, ব্রি ধান ৪৬ এবং ৬৯ ডায়াবেটিক প্রতিরোধী গুণসম্পন্ন।

সংশোধিত সোরজান একটি সম্ভাবনাময় এবং জলবায়ু সহনশীল প্রযুক্তি। যা ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়েছে দক্ষিণের উপকূলীয় এলাকার জন্য। স্থানীয় খালে ক্যাটফিশ চাষ এবং পাড়ে বেড়া দিয়ে সবজি চাষ করা যায়। মাচায় লাউ, নিম্ন জমিতে কুমড়া, বেগুন চাষ করেও ভাল উপার্জন সম্ভব। বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর বেলে মাটিতে মিষ্টি কুমড়া, মিষ্টি লাউয়ের মতো শস্য চাষ করা যায়। এগুলো বন্যাপ্লাবিত ও অপুষ্টির শিকার মানুষের জন্য লাভজনক জলবায়ু সহনশীল প্রযুক্তি।

প্রবন্ধঃ নদী ক্ষয় ও সামাজিক আন্দোলন

(রিভার ডিগ্রেডেশন অ্যান্ড সোস্যাল মুভমেন্ট)

- শরীফ জামিল, কোঅর্ডিনেটর, পানি রক্ষক বাংলাদেশ, যুগ্ম সচিব- বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনকর্তৃক প্রনীত।

মূলকথা:
নদী বাংলাদেশের কৃষির পানির প্রাথমিক উৎস। বাংলাদেশের প্রায় ১.৭২ মিলিয়ন

শরীফ জামিল

বর্গকিলোমিটার এলাকা পানি বহন করে যার ৯৩% বাইরের এলাকা- ভারত, নেপাল, ভুটান ও চীন থেকে আসে। সীমানা অতিক্রম করে বাৎসরিক গড়ে ১২০০ কিউবিক কিলোমিটার পানি নদী দিয়ে আসে। উজানের দেশসমূহের নদীর পানি আটকে দেওয়া বাংলাদেশের পরিবেশ, বাস্তুসংস্থান ও সামাজিক-অর্থনৈতিক ভারসাম্য ও প্রগতির জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ। জলজ বাস্তুসংস্থানের প্রয়োজনীয় পানি প্রবাহের অভাব পানি ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তুসংস্থানের ভাঙনের অন্যতম কারণ। বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে নদীপ্রবাহ এলাকার পরিবর্তন হচ্ছে। নদীর উৎসসমূহে দূষণ জলজ প্রাণীর বিলুপ্তির কারণ। নদীর ধারা প্রবাহ বর্তমানে নদীর বাস্তুসংস্থান, মাছের সংখ্যা, খাদ্য বনাঞ্চল সৃষ্টি ও পুষ্টিচক্র ইত্যাদির চালিকা শক্তি। শুষ্ক সময়ে কম পানিপ্রবাহ নদীতে মাটি অধঃক্ষেপ বৃদ্ধি করে এবং নদীর গঠনরূপ পাল্টে দেয় যা মৌসুমের আকস্মিক বন্যাকে আরো ধ্বংসাত্মক করে। গঠনরূপের পরিবর্তন এবং কাঠামোগত সহায়তার অভাব বিভিন্ন প্রকারে নদী দখলকে ত্বরান্বিত করে। বাংলাদেশের অস্তিত্ব ও নদী বাস্তুসংস্থানের জন্য ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প মারাত্মক ঝুঁকি হিসেবে বিবেচ্য। এছাড়াও বাংলাদেশের সম্পূর্ণ অর্থনীতি পানির অভাবে অচল হয়ে পড়বে কেননা, তা কৃষি উৎপাদন, মৎসচাষ, বন, নাব্যতা এবং বিশুদ্ধ পানির উৎসকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করবে। বহুপাক্ষিক আন্তঃসীমান্ত কার্যকলাপও উপকূলে লবণাক্ততা ও বাংলাদেশের দণিাঞ্চলের বাস্তুসংস্থান ধ্বংসের কারণ। অপরিকল্পিত খনি এবং অর্থনৈতিক কাজ উজানে সাংঘাতিক আন্তঃসীমান্ত দূষণ ঘটাচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরে নিয়ন্ত্রণহীন শিল্পায়ন দূষণকে আরো বাড়াচ্ছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় বহু নদী অস্তিত্বের সংকটে আছে। শুষ্ক মৌসুমে পানির অভাব এবং বর্ষায় আকস্মিক বন্যা কৃষকদের জীবন ও জীবিকায় প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলছে। বাংলাদেশে নদী রক্ষায় বহু আন্দোলন গড়ে উঠেছে। এখানে বড়াল নদী এবং বড়াল নদী রক্ষা আন্দোলনকে সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হলো।

২২০ কি.মি. লম্বা বড়াল নদী পদ্মা নদীর একটি মূল শাখা যা রাজশাহীর চারঘাট থেকে উৎপন্ন হয়ে যমুনা নদীতে পতিত হবার আগ পর্যন্ত চলন বিল দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। পদ্মা ও যমু-নার সরাসরি সংযোগ হওয়ায় বড়াল ছিল চলনবিলের প্রাণস্বরূপ। নদীটি এখন মৃতপ্রায়। কেননা গাঙ্গেয় প্রবাহের হ্রাসের ফলে এর ধারা হারিয়ে গেছে এবং এর দৈর্ঘ্যে বহু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। স্থানীয় প্রভাবশালী চক্রের কারণে প্রায় পাঁচ মিলিয়ন লোকের জীবিকার উৎস এই নদীর বিভিন্ন অংশ দখল হয়ে গেছে। নদীটি চলনবিলের সেচব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতো। এছাড়াও স্লুইসগেটের মাধ্যমে সরকারি সংস্থার লোকেরা একে বদ্ধ জলাশয়ে রূপান্তর করেছে, যা এখন মাছের হ্যাচারি হিসেবে ব্যবহৃত।
২০০৮ সালে সেভ বড়াল আন্দোলন শুরু হয়।

একটি দায়িত্বশীল কমিটি গঠিত হয় আন্দোলন অব্যাহত রাখার জন্য। ২০০৮ ও ২০০৯ সনে ১৪টি উপজেলায় বিভিন্ন জনসংযোগ, র‍্যালি, মিটিং, মানববন্ধন, প্রেস কনফারেন্স এর পর চাটমোহর পাইলট স্কুলের কাছে আরেকটি বাঁধ নির্মাণ স্থগিত হয়। একটি গণস্বাক্ষরও পাঠানো হয় নদী তীরের হাজারো মানুষ এবং শিক্ষিত সমাজের পক্ষ থেকে। ২০০৯ সনে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় কমিটি বড়াল নদীতে লিজ বাতিল করে এবং স্লুইসগেট ও বাঁধ সরানোর নির্দেশ দেয়। প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকেও বড়াল নদীর মুক্তির নির্দেশনা আসে। ২০১২ সনে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান একেএম মোজাম্মেল হক বড়াল নদীর সীমানা চিহ্নিত করতে ডেপুটি কমিশনারকে চিঠি পাঠান। ২০১৩ সালের মার্চে ২২০ কি.মি. দীর্ঘ মানববন্ধনের আয়োজন হয়। চল্লিশ হাজার পোস্টার এবং পাঁচ লক্ষ লিফলেট বিতরণ করা হয়। হাজারো মানুষ সেই মানববন্ধনে অংশ নেয়। ন্যাশনাল টাস্কফোর্সের কাছে বড়াল রক্ষা আন্দোলনের পক্ষ থেকে ছয় দফা সম্বলিত একটি প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। নদী রক্ষার স্বার্থে একটি মামলা দায়ের করা হয়, যার প্রেক্ষিতে উচ্চ আদালত বড়াল নদীর প্রতিবন্ধকতা সরানোর আদেশ দেন। ২০১৫ সনে মাননীয় জাহাজ ও পানিসম্পদ মন্ত্রী বড়াল নদী পরিদর্শন করেন এবং রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনারের অফিসে কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকে বসেন। আবারো বড়ালের সকল প্রতিবন্ধকতা সরানোর নির্দেশ আসে। কিন্তু পানি সম্পদ উন্নয়ন বিভাগ নতুন এবং ভিন্ন ধারনা নিয়ে আসে টাস্কফোর্সের কাছে। জনতার আন্দোলন অব্যাহত ছিলো বড়াল অবমুক্ত করতে। ২৪ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে বড়াল নদী অবমুক্তির সিদ্ধান্ত পুনর্ঘোষিত হয়। বর্তমানে দহপাড়া বাঁধ, নিউ মার্কেট বাঁধ ও চাটমোহর বাঁধ সরানো হয়েছে এবং ব্রিজ নির্মাণের কাজ চলছে। রামনগর বাঁধও শীঘ্রই সরানো হবে। চারঘাটে আরো ১৬০০ মিটার জায়গা খনন করা হয়েছে। মানুষ আশা করছে স্লুইসগেটসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধকতাও সরানো হবে। বড়ালকে সম্পূর্ণ ড্রেজিং করে চলন বিলকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে।

প্রবন্ধের ওপর আলোচনা:

রেজাউল করিম চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক, কোস্ট, ঢাকা একজন সুচিন্তক আলোচক হিসেবে দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বলেন, সার্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বাংলাদেশে সরকারের পাশাপাশি বহু এনজিও কৃষি ও পরিবেশের জন্য উল্লেখযোগ্য কাজ করছে। বাংলাদেশের মানুষ প্রচুর প্রযুক্তি ব্যবহার করে। উপযুক্ত ও পরিকল্পিত পদ্ধতি এবং লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার কৃষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে। তিনি আরও বলেন, কীটনাশকবিহীন শস্য ও মাছ উৎপাদনের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি তিনটি প্রধান প্রস্তাবনা দেন- ১. গ্রামীণ ও নগর এলাকায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ উপকূলীয় এলাকায় উপযুক্ত জমি রক্ষা প্রয়োজন; ২. সুসংহত পানি ব্যবস্থাপনা দরকার, যেটি মৎস উৎপাদনে সহায়ক হবে, এবং ৩. পানি সংকটে নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগ প্রয়োজন; যেমন আরো গভীর নলকূপ স্থাপন, উপযুক্ত সংরক্ষণের মাধ্যমে ভূউপরিস্থ পানি বৃদ্ধি, ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি।

সুরাইয়া বেগম, ডেপুটি ডিরেক্টর, রিইব, ঢাকা

রেজাউল করিম চৌধুরী

সুরাইয়া বেগম

মো:মুজিবুল হক মুনির

ড. মাহফুজুল হক

ড. নিলুফার হাই করিম

ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা

আলোচক হিসেবে বিভিন্ন প্রবন্ধগুলোর উপরে সমালোচনা তুলে ধরেন। প্রথম প্রবন্ধের বিষয়ে তিনি সমস্যা খোঁজার চেয়ে চ্যালেঞ্জের ওপর আলোকপাতের পরামর্শ দেন। কেননা চ্যালেঞ্জগুলোই প্রথমে কাটিয়ে উঠতে হবে এবং কৃষকদের কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্বন্ধে জানতে হবে। তিনি আরো বলেন, এতে নারীদের অংশগ্রহণ সম্বন্ধে কোন আলোচনা হয়নি যদিও নারীরাও এই সেক্টরে বহু আগে থেকেই কাজ করছে। তিনি জলবায়ু পরিবর্তন নীতিকে লিঙ্গ-সহায়ক করার পরামর্শ দেন। তিনি দ্বিতীয় প্রবন্ধের তথ্যগুলোকে হাতে-কলমে ব্যবহার উপযোগী হিসেবে উল্লেখ করেন। স্থানীয় ধানের জাত, মূল্য, উৎপাদন এবং চাহিদা পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহে রাখা উচিত। জলবায়ু সহন এখানে একটি বড় চিন্তার বিষয়। কৃষকদের কাছে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলাফলকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে হবে এবং নীতিমালা প্রণয়ন পর্যায়ে তাঁদেরকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

উন্মুক্ত আলোচনায় মোহাম্মদ মুজিবুল হক মুনির বলেন, বীজের মান ও পরিমাণের সাথে সাথে ভূমির মান ও পরিমাণের বিষয়টিও মনে রাখা জরুরী। সবকিছুর জন্যেই কারিগরী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ আবশ্যক। ড. মো. আতিকুর রহমান কৃষির সর্বাত্মক পদ্ধতি এবং নীতিমালা প্রণয়ন ও গবেষণায় কৃষককে সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে যুক্তি দেন। তিনি যোগ করেন যে, জমি এবং বীজের পাশাপাশি নদীও গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি নিয়ে বিতর্ক চলতেই থাকবে, কিন্তু আমাদের নজর দিতে হবে টেকসই বিকল্পের দিকে। নীতিমালা হতে হবে পরিবেশবান্ধব, কেবলই সমাধানমুখী নয়। কৃষি, সার এবং জল নীতিমালা পর্যালোচনা করতে হবে। ড. মাহফুজুল হক জলবায়ু সহনশীল পদ্ধতির ওপর দৃষ্টিপাত করেন। ড. নিলুফার হাই করিম বলেন, ধানের জাতগুলো হতে হবে খরা এবং বন্যাসহিষ্ণু এবং এসবের সঠিক তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা সেশনের সভাপতি হিসেবে উল্লেখ করেন, কৃষকদের দৃষ্টিকোণ এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সাথে স্থানীয় পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখে জাতীয় পর্যায়ে নীতিমালা প্রণয়ণ করতে হবে। তিনি কৃষকদের অন্তর্ভূক্তকরণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুগুলোর রাজনীতিকীকরণের ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেন।

এই সেশনের সামগ্রিক সুপারিশগুলো নিম্নরূপ:

। প্রতিষ্ঠানসমূহ: প্রযুক্তির ব্যবহার হতে হবে পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে সঠিক প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতির মাধ্যমে এবং স্থানীয়ভাবে নির্দিষ্ট।

। আন্দোলন: বছরভিত্তিক সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনার বদলে দীর্ঘ টেকসই পরিকল্পনার ব্যাপারে মানসিক প্রস্তুতির দরকার। এজন্যে একটা বৈজ্ঞানিক পথে সম্পদ সংরক্ষণ হবে অগ্রযাত্রার প্রথম ধাপ। একইভাবে, অভিযোজন ও প্রশমনের জন্যে অনুসন্ধানও জরুরী এবং টেকসই উন্নয়নের জন্যে নীতিমালা সামগ্রিক ও স্থায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

। নীতিমালা: যেহেতু বাংলাদেশের কোন জলবায়ু পরিবর্তন নীতিমালা নেই, সেহেতু জ্বালানি, পানি এবং ভূমি সংক্রান্ত ইস্যুগুলোকে কৃষি-জলবায়ু নীতিতে সম্পৃক্ত করা উচিৎ, যেটি পরবর্তীতে অভিযোজন ও প্রশমন প্রক্রিয়ার পথ খুলে দেবে। কৃষি ও পরিবেশ রক্ষার নীতিমালা হওয়া উচিৎ মৌলিক ক্ষেত্রগুলোর ভিত্তিতে। যেহেতু প্রযুক্তি ব্যবহারের কথা হচ্ছে, সেহেতু আয়-ব্যয়ের হিসাবও আবশ্যক। নীতিমালায় নারীর অংশগ্রহণ থাকতে হবে।

অধিবেশন ৩:
জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কর্মসূচি এবং কৃষিক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ

প্রবন্ধঃ জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষিঃ ব্যবহার ও ভবিষ্যত

(ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচারঃ প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রসপেক্টস্)

- ড. সোহেলা আখতার, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, বারি, গাজীপুর

মূলকথাঃ

জলবায়ু পরিবর্তনকে চিহ্নিত করা যেতে পারে কিছু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দিয়ে, যেমন- গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি, বৃষ্টিপাতের পরিবর্তন, তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাতের পরিবর্তনশীলতা, জলের স্তরের নিম্নতা, জলসীমা শুকিয়ে যাওয়া, খরা ও বন্যার মতো ঘটনাসমূহের তীব্রতা বৃদ্ধি এবং বাস্তুতন্ত্র বাধাগ্রস্ত হওয়া ইত্যাদি। পরিবর্তিত জলবায়ুর প্রভাব মোকাবেলায় বিকল্প কৃষির উপর আলোচনা করা হলো।

সংরক্ষণশীল আবাদের চর্চা করে উদ্ভিদের ক্ষতি হ্রাস করা যায়। কম কর্ষণের মাধ্যমে মাটি থেকে অর্গানিক কার্বনের ক্ষতি হ্রাস করা যায়, যা মাটির ভৌতিক, রাসায়নিক ও জৈবিক উপাদানের পাশাপাশি উন্নত ফসল উৎপাদনেও ভূমিকা রাখে। বারি পাওয়ার টিলারের দ্বারা পরিচালিত একটি জিরো টিলেজ প্লান্টার তৈরি করেছে। এটি মাটি কর্ষণ না করেই বীজ বপন ও সার প্রয়োগ করে। এটি মাটির আদ্রতা সংরক্ষণ করে। জিরো টিলেজ প্লান্টার রাজশাহী, দিনাজপুর, যশোরের মত হালকা গঠনের জমিতে গম,

ভুট্টা, কলাই চাষে ব্যবহৃত হয়। এটা ফসল উৎপাদনের খরচ ৩০% কমায়। স্ট্রিপ-আবাদ এমন একটি সংরক্ষণ ব্যবস্থা যা ন্যুনতম ভূমিকর্ষণ করে। এটি শুধু মাটির সেই অংশেই কর্ষণ করে যে অংশে বীজ বপন করা হবে। কনটার রোপণ বা কনটার ফার্মিং বা কনটার

ড. সোহেলা আখতার

বাঁধ হল এমন এক ধরনের চাষ এবং রোপণ পদ্ধতি যা সমান্তরাল রেখার উপরে করা হয়।

এডব্লিউডি হচ্ছে ধানচাষে প্রয়োজনীয় সেচের পানির পরিমাণ কমাতে সক্ষম একটি প্রযুক্তি। এতে ডিজেল ব্যবহার এবং ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের পরিমাণ কম হয়, ফলে এতে পানি ও পরিবেশের রক্ষা পায়। এটি ধানের দানায় ও খড়ে আর্সেনিকের দূষণও হ্রাস করতে পারে। ফার্টিগেশন হচ্ছে, সেচব্যবস্থায় সার ও পানিতে দ্রবণীয় অন্যান্য দ্রব্যের ইনজেকশন প্রক্রিয়া। অধিক পুষ্টি উপাদান যোগ করতে বা উদ্ভিগের পুষ্টিজনিত দুর্বলতা উপশমের জন্যে ফার্টিগেশন ব্যবহৃত হয়। ফলজ বৃক্ষ, সবজি প্রভৃতি উচ্চমূল্যের উদ্ভিদে ফার্টিগেশন ব্যবহৃত হয়। পানির অভাব অথবা লবণাক্ততার ক্ষেত্রে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করা যায়। এতে খরা ও লবণাক্ততা উপদ্রুত অঞ্চলে ফসল উৎপাদনে সুবিধা হয়। ফসলের মাঠে ছোট ছোট পুকুর খনন সেচে স্বাদুপানির সরবরাহ নিশ্চিত করে। কুনি তথা ছোট পুকুর দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষুদ্র পর্যায়ের সেচে গুরুত্বপূর্ণ। ইউরিয়া সুপার গ্রানুয়ুল (ইউএসজি) একটি অন্যতম জনপ্রিয় নাইট্রোজেন সার। সাধারণ ইউরিয়ার দানা আকারে ছোট এবং দ্রুত দ্রবণীয়। উদ্ভিদ জমিতে প্রয়োগকৃত ইউরিয়ার মাত্র ৩০% শোষণ করতে পারে। ইউএসজি আকারে বড়। এটি পানিতে ধীরে ধীরে দ্রবীভূত হয়। ফলে, উদ্ভিদ দীর্ঘক্ষণ ধরে নাইট্রোজেন উত্তোলন করতে পারে।

জৈবসার পরিবেশবান্ধব। গোবর, পোল্ট্রিসার এবং প্রথাগত কম্পোস্ট বাংলাদেশের জনপ্রিয় জৈবসার। বায়োস্লারি, ভার্মিকম্পোস্ট ইত্যাদি হচ্ছে বাংলাদেশে ব্যবহৃত নতুন জৈবসার। বায়োস্লারি হচ্ছে বায়োগ্যাস প্লান্টের উপজাত। বায়োগ্যাস প্লান্টের আউটলেট দিয়ে যে অর্ধতরল অবশিষ্টাংশ বের হয়ে আসে তাকেই বায়োস্লারি বলে। বায়োস্লারি দুই প্রকার: গোবরজাত বায়োস্লারি ও পোল্ট্রি লিটারজাত বায়োস্লারি। ভার্মিকম্পোস্ট মাটির পোকাদের দ্বারা সৃষ্ট সার। এটি পোকাদের শরীরনিঃসৃত পদার্থ (মুখের লালা), হিউমাস, ছোট ছোট পোকা, পোকার গুটি ইত্যাদি জৈব উপাদানের মিশ্রণ। আমরা বিশেষ ধরণের মেটেপোকা ব্যবহার করতে পারি, যারা বিশেষ ধরণের ভূপৃষ্ঠবাসী এবং সাধারণত জৈবসার, কম্পোস্টের গাদা, পাতার স্তর প্রভৃতি খুব সমৃদ্ধ জৈব পদার্থে বসবাস করে। এইসব পোকাদেরকে গোবর বা অন্যান্য পচনশীল জৈব পদার্থ খাইয়ে আমরা প্রয়োজনীয় পরিমাণে ভার্মিকম্পোস্ট তৈরি করতে পারি। বায়োচার একটি উচ্চকার্বণ, মিহিদানার অবশেষ যা আধুনিক পাইরোলাইসিস প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়।

বপনকালের পরিবর্তন নেতিবাচক জলবায়ুর মোকাবেলা করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। খরা, বন্যা, দাবদাহ, শীতের আক্রমণ এড়িয়ে আগাম কিংবা বিলম্বিত ফসল লাগানো বিরূপ জলবায়ু মোকাবেলার একটি শক্তিশালী অস্ত্র। মালচ হচ্ছে পদার্থের (ধানের খড়, গমের খড় ইত্যাদি) একটি আস্তরণ। মালচ ব্যবহারের কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে মাটির আর্দ্রতা রক্ষা, উর্বরতা ও মাটির স্বাস্থ্যের উন্নতি, আগাছার

বৃদ্ধি রোধ ও সৌন্দর্যবৃদ্ধি। খরাপ্রবণ কিংবা লবণাক্ত মাটিতে মালচ ব্যবহার করা যেতে পারে। মালচ বাষ্পীভবন হ্রাস করতে পারে এবং এভাবে খরাপ্রবণ মাটির আর্দ্রতা আটকে রাখতে পারে। লবণাক্ত মাটিতে এটি উপরিপৃষ্ঠে বাষ্পীভবন হ্রাস করে নিচ থেকে লোনাপানির উত্তোলন রোধ করতে পারে। বিকল্পভাবে ভাসানো বেডে চাষাবাদের একটি নিবিড় পদ্ধতি হচ্ছে সর্জান। ভেজা অথবা বন্যাপ্রবণ অঞ্চলে এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় যেখানে শুষ্ক অঞ্চলের ফসলকে ভাসমান বেডে চাষাবাদ করা হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে সর্জান আবাদপদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

আমন ধান তোলার পরে মাটিকে পিরামিডের মত করে উঁচু করে দেয়া হয়। এটি পিরামিত পদ্ধতি। এতে চালকুমড়া, করলা, শসা, চিচিঙ্গা, কদু, ঝিঙে, শিম প্রভৃতি উচ্চমুল্যের ফসল ফলানো হয়। অন্যদিকে, বন্যা কিংবা ডুবন্ত অবস্থার সাথে খাপ খাওয়ার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের পিরোজপুর, গোপালগঞ্জ এবং বরিশালের জেলাসমূহে গত দু'শতাব্দী ধরে ভাসমান চাষাবাদ হয়ে আসছে। স্থানীয় ঐতিহ্য অনুসারে 'মাটিবিহীন চাষাবাদের' (ভাসমান/ধাপচাষ) এই পুরানো পদ্ধতি বিভিন্ন ধরণের সব্জী এবং মসলা উদ্ভিদ চাষের জন্যে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ভাসমান বেডটি তৈরি করা হয় কচুরিপানা, টোপাপানা, দুলালীলতা, শ্যাওলা, নারিকেলের ছোবড়া প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের স্থানীয় উপাদান দিয়ে। লালশাক, ডাঁটাশাক, পালংশাক, ঢেড়স, কুমড়া, আদা, লাউ,মানকচু, আদা প্রভৃতি ফসল ভাসমান ক্ষেতে ফলে। রিলে পদ্ধতিতে একটি ফসল তোলার আগে আগে আরেকটি ফসল বোনা হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে আমনের সাথে পালা করে খেসারি চাষ একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি। আমন ধানের পরিপক্ক পর্যায়ে খেসারি রোপন করা হয়। আমন যখন কাটার মৌসুম, খেসারি তখন বীজ বপন পর্যায়ে। দুই ফসলেরই মোট আয়ুষ্কাল কমিয়ে দেয়া হয়, যা খরা এবং লবণাক্ততা পরিহার করে।

প্রবন্ধঃ ভারতের প্রেক্ষিতে জলবায়ু সহিষ্ণু, কৃষিপ্রতিবেশ ও সামাজিকভাবে স্থায়ী কৃষিঃ নীতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, এবং প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জ

(ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট, ইকোলজিক্যালি অ্যান্ড সোস্যালি সাসটেইনেবল এগ্রিকালচার ইন ইন্ডিয়াঃ পলিসি, সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনাল চ্যালেঞ্জ)

- ড. রঘুনন্দন, পরিচালক, সেন্টার ফর টেকনোলজি অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট, ইন্ডিয়া

মূলকথাঃ

প্যারিস সমঝোতা চুক্তি মতে, ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৩.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে, দক্ষিণ এশিয়া/ভারতে এর বাস্তব প্রভাব দেখা যাচ্ছে। যাহোক, এই চুক্তি গভীরভাবে দ্বিধান্বিত এবং অন্যায়ভিত্তিক। ভারতের গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন সংক্রান্ত প্রতীজ্ঞা মোটামুটি উচ্চাভিলাষী ও অভিযোজনমুখী। ২০৩০ সালের মধ্যে ১.৫ থেকে ২.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধির কথা। ২১০০ সনের মধ্যে দাবদাহ, গরম বাতাসের পরিমাণ ও আক্রমণের হার বৃদ্ধি, গরমের দিনসংখ্যা বৃদ্ধি, বর্ষার শুরু ও শেষের বিলম্ব, পরিবর্তনশীল বৃষ্টিপাত, বৃষ্টির দিনসংখ্যা হ্রাস, ভারীবর্ষণের দিনসংখ্যা বৃদ্ধি, নদীর প্রবাহ হ্রাস, হিমবাহের গলন, মূল নদীগুলোর ৪০% পর্যন্ত পানির বাষ্পীভবন, জলের উতৎগুলোর ক্রমহ্রাসমান জলসংরক্ষণ ক্ষমতা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, উপকূলীয় ভাঙন এবং নোনা-পানির উত্থানের সাথে সাথে তাপমাত্রা ৩.৫ থেকে ৪.৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বাড়বে।

জলবায়ুর পরিবর্তন ৪ কোটি হেক্টর জমিকে (১২% এলাকা) বন্যাক্রান্ত ও ৫.১ কোটি হেক্টর (১৬% এলাকা) জমিকে খরাপ্রবণ করবে, শুষ্ক মৌসুমী বায়ুপ্রবাহকে কমিয়ে দেবে, আর্দ্র মৌসুমী বায়ুপ্রবাহকে বাড়িয়ে দেবে, ভয়াবহ

খরা ও বন্যার জন্ম দেবে, মাথাপিছু পানির পরিমাণ কমাবে, বর্তমানের প্রায়-সঙ্কটকালীন পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে। ভূগর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতা ইতোমধ্যেই সংকটাপন্ন; কাবেরী ও সবরমতী নদীতে ইতোমধ্যেই সামুদ্রিক পানি উপরে উঠে এসেছে। জলবায়ু পরিবর্তন ৬৫% বৃষ্টিনির্ভর ফসলের অঞ্চল এবং ছোট ছোট বাড়িঘরকে আবহাওয়া-পরিবর্তনের ব্যাপারে নাজুক করে তুলবে, ধানের উৎপাদন কমাবে,

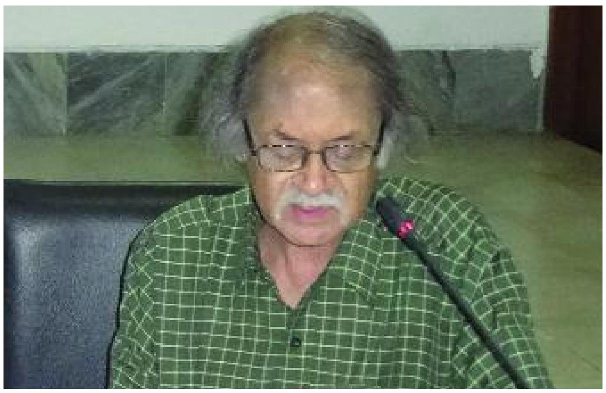

ড. রঘুনন্দন

গম, ভুট্টা, শালগম, সয়াবিন প্রভৃতির ফলন কমাবে, ২০৩০ সালের মধ্যে খাদ্য উৎপাদন কমাবে ৪-১০% ও ২০৫০ সালের মধ্যে ২০-৫০% (সেচ সুবিধাসম্পন্ন অঞ্চলগুলোর তুলনায় বৃষ্টিনির্ভর এলাকাগুলোতে বেশি কমবে), শস্যকণার প্রোটিনের পরিমাণও কমবে, পোকামাকড় বাড়বে ও নতুন এলাকায় ছড়িয়ে পড়বে, কৃষি আয় কমবে ১০-২৫%, জিডিপি কমবে ৫%, এবং খাদ্য নিরাপত্তা এবং জীবিকা স্পষ্টতই হুমকির মুখে!

২০১১ সাল থেকে চলমান জাতীয় টেকসই কৃষি মিশন বৃষ্টিনির্ভর অঞ্চলের উন্নয়ন (বহুমুখী উৎপাদন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে স্থানভেদে বহুমুখী ফসল, সংযুক্ত চাষাবাদ প্রভৃতি), মাটির স্বাস্থ্য উন্নয়ন, পানি সংরক্ষণ, পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি, অভিযোজন এবং প্রশমনের প্রতি লক্ষ্য রেখে টেকসই উন্নয়নের একটি প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছে। জলবায়ুসহিষ্ণু কৃষির জাতীয় উদ্যোগ বিভিন্ন অঞ্চলের ঝুঁকির পরিমাপ (৫৪০টি জেলা), প্রধান ফসলসমুহের জলবায়ুবৈরিতাসহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন, অভিযোজন ও প্রশমন কৌশল (ইনপুট ব্যবহারের হার, সংরক্ষণ কৃষি), কীট বিষয়ক গবেষণা, কীট-ফসল সম্পৃক্ততা, নতুন কীট, জমি প্রদর্শন ও অন্যান্য অংশীদারদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ফসল, পশুপাখী, মাছ প্রভৃতির জলবায়ুসহিষ্ণুতাকে জোরদার করে।

ইতোমধ্যেই নাজুক জনসংখ্যা আরও বেশি নাজুক হবে জলবায়ুর পরিবর্তনে। অর্থাৎ জলবায়ুর নাজুকতা বিরাজমান নাজুকতার সাথে যুক্ত হবে। ছোট/প্রান্তিক কৃষক, জেলে, বনবাসীগণ, পাহাড়ি জনগণ, উপকুলের বাসিন্দাগণ এবং যারা জীবনধারণের জন্যে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল- তাদের সবাই এর শিকার হবেন। জাতীয় টেকসই কৃষি মিশন কাঠামোগত কৃষিজ সঙ্কট, কাঠামোগত দুর্বলতা এবং আঞ্চলিক প্রয়োজনীয়তা- বিশেষত ছোট কৃষকের প্রয়োজন- প্রভৃতিকে উপেক্ষা করে স্পষ্টতই একটা দায়সারা উদ্যোগ নিয়েছে। এটি নির্দেশনামূলক, প্রয়োজনভিত্তিক নয়, যেখানে তৃণমূল সেবা ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি। জলবায়ুসহিষ্ণু কৃষির জাতীয় উদ্যোগ বৃহত্তর অর্থে একটি প্রযুক্তিচালিত পদ্ধতি, যা ক্রুটিযুক্ত “ল্যাব থেকে জমি” মডেলকেই পুনরুজ্জীবিত করে। এতে সামগ্রিক ক্ষেত্রে জলবায়ুর প্রতিকূলতা সংক্রান্ত তথ্য, পারস্পরিক সম্পর্ক/জ্ঞানপ্রবাহ সংশ্লিষ্ট তথ্য, ইত্যাদির ঘাটতি রয়েছে, এবং যেখানে সক্ষমতা সৃষ্টির বিষয়টি পর্যাপ্তভাবে আলোচিত হয়নি।

আপাত মনে হয়, কৃষকেরা তাৎক্ষণিকভাবে খাপ খাওয়ানোর মাধ্যমে জলবায়ুর প্রভাব মোকাবেলা করছেন। প্রশমন/জলবায়ু সহিষ্ণুতার ওপর চাষীদের সক্ষমতা বাড়ানো জরুরী, কিন্তু সেদিকে নজর দেয়া হচ্ছেনা। জনগণের সক্ষমতা না বাড়লে নীতিমালা বাস্তবায়ন করা যাবেনা। কৃষি সংক্রান্ত বিষয়াদি সরকারি বিষয় (কৃষি, ভূমি, পানি প্রভৃতি), যেখানে রাষ্ট্রেরই সক্ষমতা কম। উপকূলীয় লবণাক্ততার বিষয়টিও উপেক্ষিত হচ্ছে।

জলবায়ুর প্রভাব মোকাবেলায় সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি ও

প্রগতিশীল অভিযোজন প্রক্রিয়া দরকার। সহনশীলতা, জীবিকা উন্নয়ন, খাদ্যনিরাপত্তা, সম্পদ সংরক্ষণ, প্রশমন প্রভৃতির মত বহুমুখী লক্ষ্য অথবা বাড়তি পাওনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বিকেন্দ্রীকৃত অংশগ্রহণমূলক কর্মসূচী, গবেষণা এবং গ্রামীণ সৃষ্টিশীল বাস্তুতন্ত্র গ্রহণ করতে হবে। বিকল্প উন্নয়ন পরিকল্পনাকে সামনে রেখে কৃষির সঙ্কটসহ কাঠামোগত নাজুকতাকে মোকাবেলা করতে হবে।

প্রবন্ধঃ বাংলাদেশের ধানের বৈচিত্র্যের নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

(এথনো বোটানিক্যাল স্টাডি অন ট্রাডিশনাল রাইস ভ্যারাইটি ইন বাংলাদেশ)

- পাভেল পার্থ, কো অর্ডিনেটর, খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রম, বাংলাদেশ রিসোর্স সেন্টার ফর ইন্ডিজেনাস নলেজ (বারসিক)

পাভেল পার্থ

মূলকথা:

বাংলাদেশ প্রধানত ৩০টি কৃষি-বাস্তুসংস্থান অঞ্চল, ১৭টি পানিজ বাস্তুসংস্থান অঞ্চল এবং ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যময় এলাকায় বিভক্ত। বাংলাদেশের কৃষিজ এবং নদীজ খাদ্য নির্ভর জীবনের ঐতিহাসিক ভূচিত্র রয়েছে। বাংলাদেশের কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং বাণিজ্যিক অনধিকার প্রবেশের প্রভাব প্রবলভাবে বিদ্যমান। এখানে নতুন নতুন প্রজাতির ফসল উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। অথচ, আমরা প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং উচ্চমানসম্পন্ন স্থানীয় প্রজাতির শস্যের কথা ভুলে যাচ্ছি।

স্থানীয় ধানের প্রজাতির বৈশিষ্ট্যাবলী:

- স্থানীয় বাস্তুসংস্থানের সাথে মানানসই
- অধিক রোগপ্রতিরোধী
- স্থানীয় ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত
- স্বল্প উৎপাদন খরচ
- অধিক প্রাকৃতিক ধকল সহনশীল
- অধিক আবহাওয়ার ধকল সহনশীল
- অধিক সুস্বাদু এবং চাহিদা তালিকার শীর্ষে
- কৃষকরা বীজ সংরক্ষণ করতে পারে
- বীজ অদলবদলের মাধ্যমে বংশগতিগত পরিবর্তন সাধিত হয়

হাওর এলাকার ধানের প্রজাতি (সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সিলেট, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, গোপালগঞ্জ নেত্রকোণা এবং কুষ্টিয়া জেলায় চাষাবাদকৃত): কুমরি, বইয়াখাউরি, জলদীঘা, হিজলদীঘা, হলুদজাখন, লাঠিশাইল, লাখাই, জলভাঙ্গা, দীঘা, কালামানিক, গোছি, রাতা, টোপা, চুরাক।

লবণাক্ত অঞ্চলের ধানের জাত (খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পিরোজপুর এবং বরগুনা জেলায় চাষাবাদকৃত): টেকশইল, কুটেপাটনি, টিকেপাটনি, বিরপালা, নুনেশ্বর, নোনাখোছি, রায়েন্দা, বুরিমন্তেশ্বর, সাদামোটা।

খরাসহনশীল ধানের জাত (চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ এবং রাজশাহী জেলায় চাষাবাদকৃত): সোনাশাইল, বটরাজ, ঝিংগাশাইল, মালশারা, সুবন্দারি, হাঁসরাজ, বিয়ানফুল, মাগুরশাইল, রান্ধুনিপাগল, চিনি আতাব।

পার্বত্য ধানের জাত (টাংগাইল, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, মৌলভীবাজার জেলায় চাষাবাদকৃত): গালং, খবরক, গুরিয়া, মাই-রিয়ুং, আদুমা-কিতিং, মাই-বরুচিকা, মালাং-মি- মিদ্দিম, মিখোচু-ওয়াখচু, চাম্পলি-মাই, মামি-মোচোই, চুরী, নী-পিদি, জাম্মা, রাই-রিক, রাই-সা।

প্রবন্ধের ওপর আলোচনা:

এডিবি'র পরিবেশ ও জাতীয় পরামর্শক, এবং পরিবেশ বিভাগের সাবেক পরিচালক মো: রিয়াজউদ্দিনের মতে, ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার সংক্রান্ত প্রথম প্রবন্ধে জলবায়ু পরিবর্তনকে আরো ভালোভাবে সংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন। তিনি দ্বিতীয় প্রবন্ধের প্রসঙ্গ ধরে বলেন, আমাদের টেকসই উৎপাদন আরো বৃদ্ধি করা উচিত। খেয়াল রাখতে হবে যে, প্রশমনই হচ্ছে গ্রিনহাউজ প্রভাব কমানোর মূল লক্ষ্য। আর সেজন্যে আমরা প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারি। তিনি আরো বলেন, জলবায়ু সহিষ্ণুতা গড়তে কৃষিতে বৃষ্টির পানি ব্যবহার একটি উত্তম সমাধান। তিনি বিশ্বাস করেন যে, প্রশমনের সাথে ক্ষুদ্র কৃষকদের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। তৃতীয় প্রবন্ধের মূল বক্তব্যগুলো সমর্থন করে বলেন, বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় শস্যের সংরক্ষণে গবেষণা দরকার। ব্রি-এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. মোস্তফা কামাল সবগুলো প্রবন্ধকেই অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, আমাদের যা দরকার তা হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব কাটিয়ে ওঠা। সেজন্য কৃষকদের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন জায়গা হতে আসা সমস্যাগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে চলা প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন যে, গ্রিনহাউজ গ্যাস প্রশমন, কার্বনের ব্যবহার কমানো আবশ্যক এবং স্থানীয় জার্মপ্লাজম সংরক্ষণও প্রয়োজন। এছাড়াও বিভিন্ন এলাকায় একই শস্যের ভিন্ন নাম রয়েছে যা সতর্কতার সাথে দেখতে হবে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, মানুষের ক্রিয়াকলাপের কারণেই জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে এবং এটিই এখন নীতিনির্ধারণ, উন্নয়ন, তহবিলপ্রদান এবং গবেষণার ক্ষেত্রে মুখ্য চিন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি এও বলেন, বাংলাদেশ এই ঝুঁকির প্রথম সারিতে থাকায় রাষ্ট্রের প্রয়োজন নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রশমন এবং অভিযোজনের ক্ষেত্রে নজর দেওয়া। তিনি বলেন, যদিও জাতিসংঘ কিংবা বহুজাতিক কোম্পানির মতো বৈশ্বিক সংস্থাগুলো জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কাজ করে যাচ্ছে, তবুও সেখানে যদি উন্নয়ন বজায় না থাকে তবে প্রশমন এবং অভিযোজন কোন কাজে আসবে না। তিনি পানির লবণাক্ততা, নদীর পানি হ্রাস এবং খরার মতো বিষয় যা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ সে সম্পর্কে খতিয়ে দেখার তাগিদ দেন। এসব বিষয়ে ভারতের সাথে আলোচনারও পরামর্শ দেন। এছাড়াও, অধ্যাপক মুহাম্মদ বন ও নদী রক্ষায় জোর দেন। তিনি জানান যে, সবুজ বিপ্লবের পর অধিক পরিমাণে সেচ হয়তো খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করবে কিন্তু এতে করে নদীকে মৃত বানিয়ে, লবণাক্ততার পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং অবৈধভাবে নদী দখল করে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে দেওয়া হবে। তিনি জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন ও অভিযোজনের নীতির পাশাপাশি উপকূলীয় নদী ও বনাঞ্চল রক্ষার ক্ষেত্রেও সুপারিশ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক এবং মাঠ পর্যায়ের গবেষণা প্রয়োজন। এছাড়া, বৈদেশিক সাহায্যের উপরও আমাদের নির্ভরতা কমানো দরকার কেননা উন্নয়নের চেয়ে মুনাফা অর্জনেই তাদের ভূমিকা বেশি থাকে। ড. মাহফুজুল হক সিএসএ'র অন্ধকার দিকটা, বিশেষ করে রাজনৈতিকীকরণের দিকটায় পুনর্বিবেচনা করতে বলেন।

মো: রিয়াজউদ্দিন

ড.মো. মোস্তফা কামাল

অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ

অধিবেশন ৪: ক্লাইমেট স্মার্ট কৃষি (প্রভাব) এবং বিকল্পসমূহ

প্রবন্ধঃ বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম নারী কৃষক এবং তাদের প্রতিবেশনির্ভর কৃষি চর্চা

(দা জুমিয়া উইমেন ফার্মার্স অব দা চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস, বাংলাদেশ, অ্যান্ড দেয়ার এগ্রো-ইকোলোজিক্যাল প্র্যাকটিসেস)

- ড. মাহফুজুল হক, প্রাক্তন সচিব, বাংলাদেশ সরকার, ও অ্যাডজাংক্ট ফ্যাকাল্টি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

মূলকথা:

হিমালয়ের পূর্বাঞ্চলের নিম্ন এবং মধ্যম এলাকাগুলোতে জুম চাষ খুবই সাধারণ চাষাবাদ প্রক্রিয়া। এশিয়া জুড়ে প্রায় ৪০ কোটি মানুষ ক্রান্তীয় বনাঞ্চলের (ট্রপিকাল ফরেস্টের) উপর নির্ভরশীল এবং এর বেশিরভাগ মানুষই জুম চাষের পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। বর্তমানে অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং অধিক উৎপাদনের আকাঙ্খায় প্রকৃতিকে সামর্থের চেয়ে বেশি চাপ প্রয়োগের কারণে শিফটিং চাষাবাদ এবং মেষপালন হুমকির মধ্যে পড়েছে। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের কৃষিক্ষেত্রে জুমচাষ খুবই গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। পার্বত্য চট্টগ্রামের ১১টি নৃগোষ্ঠী কৃষি ক্ষেত্রে স্লাশ ও বার্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে। বেশিরভাগ ম্রো (৮৬%), ত্রিপুরা (৫৪%) এবং মারমা (৪২.৩%) জনগোষ্ঠী জুম চাষ করে থাকে। যেখানে চাকমা চাষীদের মাত্র ২২.৭% জুম চাষের সাথে সম্পৃক্ত। প্রতিবছর এই অঞ্চলের প্রায় ৪১০০০ হেক্টর

ড. মাহফুজুল হক

(মোট ফসলী জমির ১৪%) জমিতে শিফটিং চাষাবাদ হয়ে থাকে এবং ৭৩০০০ পরিবার এই ঐতিহ্যবাহী কৃষি পদ্ধতির সাথে সম্পৃক্ত।

সাধারণত এই চাষাবাদের ক্ষেত্রে নারীরাই মূল ভূমিকা পালন করে থাকে। ঝোপঝাড় পরিষ্কার এবং পোড়ানো, জমি এবং বীজ নির্বাচন, প্রথম বৃষ্টিপাতের পর সময়োপযোগী বীজ বপন, বন্যপ্রাণীর আক্রমণ থেকে জুমের মাঠ পাহারা দেয়া এবং শস্য সংগ্রহ এ সকল কাজই সাধারণত নারীরা করে থাকে। জুম হচ্ছে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ উৎপাদন ব্যবস্থা, কারণ দৈনন্দিন জীবনে যা কিছু প্রয়োজন তার প্রায় সবকিছুই তারা উৎপাদন করে থাকে। তারা ফসল ফলায়, গাছ এবং ফল উৎপাদন করে, গবাদিপশু পালন করে, নিজেদের আবাস নির্মাণ করে, নিজেদের তাঁত নিজেরাই বানায়, নিজেদের কাপড় সেলাই করে, পণ্য সংরক্ষণ করে, এমনকি তারা পণ্য বহনের জন্য ঝুড়িও বানায়। যদিও এখানে ব্যক্তিগত কোন জমি নেই, বরং অধিবাসীদের জুমের জমি দাবি করার জন্য একটি অলিখিত আইন রয়েছে। এটাকে বলা যায় জুম্ম জনগোষ্ঠীর ডি ফ্যাক্টো অধিকার, যারা বংশানুক্রমিকভাবে এই পাহাড়ি ভূমিতে চাষাবাদ করে আসছে। অন্যদিকে সরকার দাবি করছে পুরো ভূমির অধিকার রাষ্ট্রের। বন বিভাগ প্রায়ই ঘোষণা করে এটা বন বিভাগের নিয়ন্ত্রনাধীন ভূমি । এই পরিস্থিতিতে জুমের অধিকার নিয়ে সংশয় বাড়ছে এবং এরই ফলশ্রুতিতে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর চাপ বাড়ছে।

জুম চাষের ক্ষেত্রে বিশেষ করে স্লাশ এবং বার্ন পদ্ধতিতে চাষাবাদ নিয়ে কিছু সাধারণ অভিযোগ রয়েছে। এই পদ্ধতিতে চাষাবাদের দরুণ মাটির উপরিভাগ ক্ষতিগ্রস্থ হয়, মাটির উর্বরতা নষ্ট হয়, মাটির উপকারী কীট পতঙ্গের বিনাশ, মাটিক্ষয়, বন ধ্বংস এবং সর্বোপরি পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। অভিযোগ রয়েছে অনিয়ন্ত্রিত জুম চাষের কারণে খাদ্য উৎপাদন মারাত্মকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। শুধু জুম চাষের উপর নির্ভর করে একটি পরিবার বড়জোর ৭/৮ মাস জীবনধারণ করতে সক্ষম হয়। যদিও, এইক্ষেত্রে কিছু অভিযোগ আংশিক সত্য। কিন্তু এর পেছনের কারণ নিয়ে কি কেউ কোন প্রশ্ন তুলছেন? যদি এই শিফটিং চাষাবাদ প্রক্রিয়া এতই খারাপ পদ্ধতি হয়ে থাকে তাহলে কিভাবে দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় ১ কোটি হেক্টর জমি এবং লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার বেশিরভাগ ভূমি এই পদ্ধতিতে চাষাবাদ হয়ে থাকে।

পৃথিবীজুড়ে জুম চাষ পদ্ধতি পরিকল্পিতভাবে নেতিবাচক ক্যাম্পেইনের শিকার হচ্ছে। ব্রিটিশ উপনিবেশিক প্রশাসনের মাধ্যমে এই ক্যাম্পেইন শুরু হয় এবং পরবর্তী সময়ে সকল সরকারই

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমির ব্যবহারের ক্ষেত্রে নানা ধরণের প্রভাব বিস্তার করেছে। সরকারের নেতিবাচক ভাবভঙ্গী এবং কিছু উন্নয়ন সহযোগীদের জুম চাষাবাদ নিয়ে আশংকার প্রভাব পাহাড় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উন্নয়ন প্রজেক্টে এবং নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হচ্ছে। ১৯৬২ সালে কাপ্তাই বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের ফলে সেখানকার কৃষি জমির ৪০% তলিয়ে যায়। এছাড়া বন্যপণ্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান যেমন কর্ণফুলী পেপার মিলের প্রতিষ্ঠা, সমতলের ভূমিহীন বাঙালি কৃষকদের অপরিকল্পিতভাবে পুনর্বাসনের ফলে জুম চাষের মেয়াদকাল সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে। এছাড়া বন বিভাগের জুম নিয়ন্ত্রণ বোর্ড, রাবার চাষ প্রজেক্ট, এবং বান্দবানের তামাক চাষ বেড়ে যাওয়ায় জুম চাষ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। পতিত জমি হ্রাস পাওয়ায় জুম চাষের সময়কাল সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে। এর ফলশ্রুতিতে খাদ্য উৎপাদন মারাত্মকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া তারা পাহাড় থকে বাঁশ, ঝোপঝাড়, গাছ সংগ্রহ করছে এবং এগুলো স্থানীয় বাজারে বিক্রি করছে। জুম চাষের চক্র সংক্ষিপ্ত হওয়ার দরুণ মাটির উর্বরতা হ্রাস পাওয়ার ফলে ধান উৎপাদন ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে জুম্ম জনগোষ্ঠী এখন বিকল্প শস্যের দিকে ঝুঁকছে।

দুঃখের বিষয় হচ্ছে, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে জুম্ম জনগোষ্ঠী এখন কৃষিতে কেমিক্যাল, কীটনাশকের ব্যবহারের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। আগে জুম ক্ষেত্রে পোড়ানো ছাই কীটপতঙ্গ দমনে ব্যবহার করা হত। বর্তমানে জুমের চক্র সংক্ষেপিত হওয়ায় এবং বিশেষ করে আদা এবং হলুদ কম সময়ে অধিক উৎপাদনের আশায় কৃষকেরা এখন রাসায়নিক সার (যেমন ইউরিয়া ও পটাশ) এবং কীটনাশক ব্যবহারের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ যেমন সাইক্লোন, অতি বৃষ্টি, জলবায়ুর পরিবর্তনশীলতা, পার্বত্য চট্টগ্রামে ইঁদুরের দৌরাত্ম এবং দুর্ভিক্ষ এর আগে কখনোই দেখা যায়নি। ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড মাউন্টেন ডেভেলপমেন্ট, কাঠমান্ডু, নেপালের বেশ কয়েকটি কেস স্টাডিজে দেখানো হয়েছে যে, শিফটিং চাষ পদ্ধতি সমাজ ও চাষী উভয়ের জন্যেই সুবিধাজনক। গবেষণায় দেখানো হয় যে, বীজ সংরক্ষণ, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, কৃষি-প্রতিবেশ, মাটি এবং পানি সংরক্ষণ, জৈবিক চাষ, পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অখণ্ডতা এবং সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে শিফটিং চাষপদ্ধতি অবদান রাখে।

প্রবন্ধঃ টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবনযাত্রার জন্য কৃষক এবং জেলেদের সাথে নিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলাঃ ভোলা দ্বীপে কোস্টের অভিজ্ঞতা এবং প্রচেষ্টা

(ফাইটিং ক্লাইমেট চেঞ্জ ইমপ্যাক্ট উইথ ফার্মারস্ অ্যান্ড ফিশারস্ ফর সাসটেইনেবল ফুড সিকিউরিটি অ্যান্ড লাইভলিহুডঃ কোস্ট এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড এফোর্টস্ ইন ভোলা আইল্যান্ড)

- মোঃ মুজিবুল হক মুনির, ডেপুটি ডিরেক্টর, কোস্ট, ঢাকা

মূলকথাঃ

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের কৃষি হুমকির মুখে পড়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্যে দায়ী দেশগুলোকে বাংলাদেশের কৃষিতে পর্যাপ্ত

মো: মুজিবুল হক মুনির

ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। বাংলাদেশকেও নিজেদেরকে এ বিষয়ে প্রস্তুত করে তুলতে হবে, কৃষকদের সামর্থ্য বাড়াতে হবে, এবং নতুন টেকসই প্রযুক্তির সাথে নিজেদের অভিযোজিত করে তুলতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করে জীবনধারণ টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে বিকল্প জীবনধারণ পদ্ধতি বের করতে হবে। কোস্টের কিছু পদক্ষেপ এখানে তুলে ধরা হলো:

প্রতিবেশ-বান্ধব টেকসই কৃষি প্রযুক্তি:

- ভার্মি কম্পোস্ট (রাসায়নিক সারের বিকল্প জৈব, প্রতিবেশ-বান্ধব সস্তা সার)
- সেক্স ফেরোমোন (শত্রু বিনাশ, বন্ধু সংরক্ষণ, পরিবেশ সংরক্ষণ)
- লিফ কালার চার্ট (উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ক্ষতি হ্রাস)
- মারিয়া মডেল (গুনগত বীজ খোঁজা এবং সংরক্ষণের উপায়)
- পোরাস পাইপ (খরচ কমানো, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বিশ্ব সংরক্ষণ)
- গুটি (গ্রানুলার) ইউরিয়া (কম ইউরিয়া দিয়ে উচ্চ ফলন নিশ্চিত করা)

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বিকল্প জীবনধারণের উপায় নির্ধারণে কোস্টের প্রচেস্টা:

- মিনি হ্যাচারি (বাচ্চা উৎপাদন): মিনি হ্যাচারি একটি স্থানীয় কৌশল যেখানে উত্তপ্ত চালের গুঁড়ার মাধ্যমে মুরগী/ হাঁসের ডিম ফোটানো হয়।
- ছাগল পালন (বিকল্প জীবনধারণের পদ্ধতি): ছাগলের রক্ষণাবেক্ষণে অনেক জমি প্রয়োজন হয় না এবং অধিক খরচেরও প্রয়োজন হয় না। বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে, বেশিরভাগ দরিদ্র নারী বা অন্যান্য পরিবার তাদের বাড়ির পাশেই ছাগল পালন করে থাকে।
- মডেল ব্রিডিং (ডিম উৎপাদন): কোস্ট পোল্ট্রি চেইন স্থাপন করার চেষ্টা করছে। এর একটি অংশ হিসেবে কোস্ট মডেল ব্রিডিং এর প্রচার করছে। এটা হাঁস, মুরগি পালন এবং প্রজননে একটি স্থানীয় পদ্ধতি।
- বিফ ফ্যাটেনিং বা গরু মোটাতাজাকরণ (ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা: নিশ্চিত মুনাফা): গরু মোটাতাজাকরণ একটি লাভজনক ব্যবসা, এবং এটি গ্রামীণ জনগোষ্ঠী সহজে করতে পারে। বিফ ফ্যাটেনিং মানে হল স্বল্প সময়ের জন্য বিশেষ এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে গরুকে স্বাস্থ্যবান করা।
- ভ্যাকসিনেটর (গবাদিপশু পালন, আয় বাড়ান)ঃ কোস্ট গ্রামীণ নারীদের প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়ে গবাদিপশু পালনকে উৎসাহ দিচ্ছে।
- গরু পালন: ক্ষমতার উৎস
- পল্লী অঞ্চলে হাঁস-মুরগি পালন (পরিবারগত প্রচেষ্টা: জাতীয় প্রভাব)
- ঘরোয়া স্তরে বাক স্টেশন

প্রবন্ধঃ প্রকৃত জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষি কার্বন মার্কেট থেকে আলাদা হবে, কেন্দ্রিয়ভাবে শিল্পনির্ভর সমাধান থেকে সরে আসুন, এবং স্থানীয় সমাধান ও নিয়ন্ত্রণের পথ খুলে দিন

(রিয়েল ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার মাস্ট ডিলিংক ফ্রম কার্বন মার্কেট, লোয়ার এমফ্যাসিস অন সেন্ট্রালাইজড ইন্ডাস্ট্রিয়াল সলুশনস্ অ্যান্ড বি ওপেন টু লোকাল রেসপনসেস অ্যান্ড কন্ট্রোল)

- সৌম্য দত্ত, ভারত জন ভিজ্ঞান জঠা

মূলকথাঃ

কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সঙ্কট অত্যন্ত বাস্তবিক। দুই ধরণের প্রভাব (সর্বনাশা ও ধীরগতির সূত্রপাত) ইতোমধ্যেই একটা বিশাল ভাঙন আরম্ভ করে দিয়েছে। ২০১৫ সালের খরা ভারতের অর্থনীতিতে আনুমানিক ১০০ বিলিয়ন ডলারের অথবা জিডিপির ৫% এর কাছাকাছি ক্ষতি সাধন করে যা

সৌম্য দত্ত

মোটাদাগে অর্থনীতির উন্নতিটাকেই ছেঁটে ফেলেছে। ৫০% এর বেশি ভারতীয় কৃষক মারাত্মকভাবে ভুগেছেন। শিল্পায়িত কৃষি গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যার অন্যতম প্রধান হোতা। আদর্শায়ন, সমরুপায়ন, সর্বরোগের সমাধান, ও সম্পদের কেন্দ্রীভবনের মত বৃহৎ শিল্প প্রক্রিয়ায় মূলধারার ক্লাইমেট স্মার্ট কৃষির ধারণা তৈরি করা হয়েছে।

জলবায়ু সঙ্কটের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সময় ও স্থানের দিক থেকে আবহাওয়ার ধরণ অনুমান করা যাচ্ছে না। এর ফলে একটা ক্ষুদ্র ভৌগলিক সীমানাই বদলে যেতে পারে! একারণে আবশ্যিকভাবে স্থানীয় পর্যবেক্ষণ, তদারকি এবং সমাধানের সক্ষমতা গড়ে তুলতে হবে। কোনও কেন্দ্রীভূত, অভিন্ন সমাধান প্রচুর সময় ও সম্পদের ব্যয় ঘটাবে এবং কম সহনশীল হবে। তার ওপর, এই কেন্দ্রীভূত "জাদুর বুলেট" মার্কা সমাধান স্থানীয় কৃষি সম্প্রদায়ের উদ্যোগ ও সক্ষমতার বহু বাইরে থাকে, ফলে কৃষকরা হয়ে ওঠেন কেন্দ্রীভূত সমাধানের অসহায় নিষ্ক্রিয় বাস্তবায়নকারী। আবহাওয়ার ধরণ অনুমান করা না গেলে স্থানীয় প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও কৃষি ব্যবস্থা ব্যাহত হবে, এবং সেটি আদৌ স্মার্ট হবে না।

মূলধারার ক্লাইমেট স্মার্ট কৃষির আরেকটা বড় বিপদ হচ্ছে, কার্বন মার্কেটের ওপর এক চোখ রেখে নিঃসরণভিত্তিক প্রশমনের ওপর গুরুত্ব প্রদান। দৃশ্যত, বিশ্বব্যাংক এবং জাতিসংঘ সিডিএম'র মত কার্বন মার্কেটের ভয়ানক ব্যর্থতা থেকে কোনও ইতিবাচক শিক্ষাই নেয়নি! বৃহত্তর পরস্পর সংযুক্তবাজারগুলো নিজস্ব নিয়মনীতিতে চলে, যেখানে কৃষির সাথে সরাসরি যুক্ত নয় এমন সব নিয়ামক ও নিয়ন্ত্রক অবস্থান করছে। কৃষি উৎপত্তিগতভাবে একটা ধীরগতির, ধৈর্য্যশীল প্রক্রিয়া, যেখানে অনেক প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া এই চক্রে বা চক্রগুলোতে সমন্বিত হয়।

কার্বন মার্কেটের দ্রুতগতির পরিবর্তনের সাথে সাড়া দিতে কৃষিকে বাধ্য করার একটা ভয়ঙ্কর বিপদ আছে। জলবায়ুর পরিবর্তন ও অননুমানযোগ্যতার সাথে সাথে আমাদের মত দেশগুলোর অসহযোগী অর্থনৈতিক নীতিমালা কৃষি ও কৃষকের ওপর চাপ বাড়াবে।

প্রবন্ধের ওপর আলোচনা:

বারি'র মৃত্তিকাবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. সোহেলা আক্তার জুমচাষ মাটির ক্ষয় এবং পুষ্টি উপাদান হ্রাস করে কিনা তার পরীক্ষা করার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষির ওপর নজর দিতে হবে, কারণ এগুলো গ্রিন হাউজ গ্যাসের নিঃসরণ হ্রাস করে। তিনি আরো বলেন, ভার্মিকম্পোস্ট ব্যবহার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার একটা বিকল্প হতে পারে, আর এটা পরিবেশ দূষণ কমাবে। জনাব মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দিন কৃষকদের জন্যে সর্বোত্তম ফলাফল আনার জন্যে জলবায়ু স্মার্ট কৃষি পদ্ধতিগুলোর যথার্থ নিরীক্ষণের ওপর জোর দেন। পাশাপাশি তিনি যোগ করেন যে, কৃষি সংশ্লিষ্ট জনগণকে গ্রিন হাউজ গ্যাস সম্পর্কে আরও যত্নবান হতে হবে যেহেতু এতে কেবল কার্বনই থাকেনা, মিথেনও থাকে। ফলে, কর্তৃপক্ষের কোনও পদক্ষেপ অবশ্যই পরিস্থিতি নির্ভর হতে হবে।

ড. দেবল দেব তিনটি প্রবন্ধেরই সমালোচনা করেন। তিনি প্রথম প্রবন্ধ প্রসঙ্গে বলেন, জুম যে একটা বিনাশী চাষ- এইটা একটা ভুয়া ধারণা। বাস্তবে এটি সবচেয়ে বেশি উৎপাদনশীল এবং এতে মাটির ক্ষয় সবচাইতে কম হয়। জুমের জন্যে স্থানান্তরকরণ জরুরি, যার অর্থ হলো একটা নির্দিষ্ট এলাকায় বারবার চাষের বদলে একটা চক্র ধরে বিভিন্ন জায়গায় চাষাবাদ করা। এটা একটা টেকসই পদ্ধতি, যেটি ৩০ বছরে চক্র পূর্ণ করে। তিনি যোগ করেন, কৃষি এবং বনবিভাগের উচিৎ সঠিক ভূমিনীতিমালাসহ সঠিকভাবে জুমচাষের কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব নেয়া। দ্বিতীয় প্রবন্ধের ব্যাপারে ড. দেব প্রথাগত চাষাবাদের মাধ্যমে জিন (বংশগতি সম্পদ) সংরক্ষণের পরামর্শ দেন। পাশাপাশি তিনি বলেন, মাছ ধরার সঠিক পদ্ধতি এবং সম্পদ সংরক্ষণ করে খাদ্য নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। জলবায়ু সমন্বয়যোগ্য পদ্ধতিগুলোর সাথে মৎস্য চাষকেও সংযুক্ত করা উচিৎ। তৃতীয় প্রবন্ধের ব্যাপারে ড. দেব কিছু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নির্দেশ করেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন, বায়োচার বিশেষ করে কাঠ থেকে কার্বন তৈরি করে যা ক্ষুদ্র জীবসংস্থানের উপস্থিতি নিশ্চিত করে। এর পিএসএম ব্যাক্টেরিয়া সংবর্দ্ধন করে, যা কৃষির জন্যে লাভজনক। এটি পুষ্টি উৎসগুলোকে শক্তিশালী করে এবং বন্যায় ধুয়ে যায়না। এটাকে টেকসই কৃষির সাথে সংযুক্ত করা উচিৎ কিন্তু দুশ্চিন্তার বিষয় হলো কাঠের ব্যবহার, যা বনভূমি উজাড়ের দিকে নিতে পারে। যেহেতু বৈজ্ঞানিকভাবে ছোটছোট ঝোপঝাড়গুলো কাঠের বিকল্প হতে পারে, সেহেতু বন উজাড়করণ ঘটার সুযোগ নেই। কিন্তু এটা মাথায় রাখা জরুরি যে সবই হতে হবে পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে।

ড. সোহেলা আক্তার

মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দিন

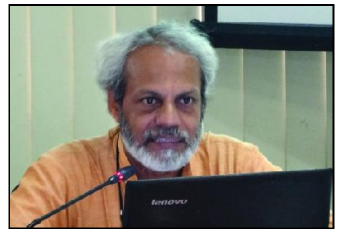

ড. দেবল দেব

অধিবেশন ৫ঃ ক্লাইমেট স্মার্ট কৃষি (প্রভাব) এবং বিকল্পসমূহ

প্রবন্ধঃ বর্তমান প্রশ্নের জবাবে প্রথাগত জ্ঞান ও পদ্ধতির অনুসন্ধান

(এক্সপ্লোরিং ট্রাডিশনাল উইজডম অ্যান্ড প্র্যাকটিসেস অ্যাজ রেসপনস্ টু কারেন্ট কোশ্চেনস্)

- বিজু নেগি, বীজ বাঁচাও আন্দোলন, ভারত

মূলকথাঃ

সূচনার প্রারম্ভ থেকে কৃষিকাজ কখনো সমস্যাবিহীন ছিলো না। এর গোড়াপত্তনও একদিনেই ঘটেনি বরং তা ছিলো দিনের পর দিন উদ্ভাবন, আত্তীকরণ এবং অভিযোজনের দীর্ঘ প্রক্রিয়া। এই পুরো প্রক্রিয়াতে কৃষকদের, বিশেষ করে দুইটি সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়েছে। প্রাকৃতিক বা ভৌত এবং রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক সমস্যা। বন্যা, খরা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ সবসময়ই ছিলো এবং কিছু ক্ষেত্রে এগুলো মানব ইতিহাসের পাতা থেকে কতিপয় মানবগোষ্ঠীর বিলুপ্তির কারণও হয়েছে। আর এখন তা প্রাণী ও উদ্ভিৎ প্রজাতিসমূহের ত্বরিৎ বিলুপ্তি ঘটাচ্ছে। অযোগ্য, অপর্যাপ্ত এবং আংশিক বাস্তবায়িত নীতি এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তসমূহ হতে সৃষ্টি হয়েছে রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক সমস্যাসমূহ।

ঐতিহ্যগতভাবে, বন্যাকে কখনোই সমস্যা বা মানব অস্তিত্বের শত্রু হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি বরং বন্ধু ভাবা হয়েছে। যা ফসলি জমিতে বয়ে এনেছে খনিজসমৃদ্ধ পলিমাটি

এবং সারাবছরে প্রচুর কৃষি উৎপাদন সুনিশ্চিত করেছে। মানুষ বন্যাকে নদীর একটি স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবেই নিয়েছে এবং একটি নির্দিষ্ট ঋতুর সাময়িক উপদ্রব হিসেবেই গ্রহণ করেছে। এমনকি ভারতের উত্তর প্রদেশ ও বিহারের পূর্বাঞ্চলীয় এলাকাসমূহে মহিলারা বন্যার আগমনী গীতও গেয়েছে। খুবসম্ভবত অন্যান্য সকল অঞ্চলেই একই রীতি প্রচলিত ছিলো। কিন্তু সরকার বাৎসরিক বন্যাকে একটি সমস্যা হিসেবে দেখেছে এবং বন্যার পানি যাতে গ্রামে প্রবেশ না করে তাই বাঁধ নির্মাণ

বিজু নেগি

করেছে। ভারতের উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে নদীর গতিপথ সাধারণত পশ্চিম থেকে পূর্ব কিংবা উত্তর পশ্চিম থেকে দক্ষিণ পূর্ব দিকে থাকে যেখানে বাঁধগুলো উত্তর-দক্ষিণ অক্ষে অবস্থিত। এই বাঁধসমূহ নদীর স্বাভাবিক ধারাকে রুদ্ধ করার জন্যই নির্মিত। সরকারের এই পদক্ষেপের ফলে বর্তমানে বাঁধগুলোই সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং লাভের তুলনায় ক্ষতিই বেশি করছে। এগুলো ক্ষয়ক্ষতি ও বন্যা পরবর্তী সমস্যাসমূহও বাড়িয়ে তুলছে।

সবুজ বিপ্লবকে সমস্যার সমাধানস্বরূপ উপস্থাপন করা হয়েছে। আমাদের বেশিদূর যেতে হবেনা, যেহেতু সবুজ বিপ্লবের সমস্যাবলী বিষদভাবেই উল্লেখিত রয়েছে। শুধু ভারতজুড়ে কৃষকদের অব্যাহত আত্মহত্যা, পাঞ্জাবের মাদকসমস্যা ও ক্যান্সারের দিকে তাকালেই হবে। এগুলো সবুজ বিপ্লবের বাহক রাসায়নিকের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ফল। লক্ষ্য করার মতো বিষয় যে, ক্ষুধা ও অপুষ্টির কারণ কিন্তু অপর্যাপ্ত শস্য উৎপাদন ছিল না, বরং বৈষম্যমূলক বণ্টনের ফল ছিলো। যখন ক্ষুধা ছিলো প্রধান সমস্যা তখন সবুজ বিপ্লব সমাধান হিসেবে উপস্থাপন করেছিলো উৎপাদনকে। এখানে কথার একটি সুন্দর মারপ্যাঁচ আছে। কে এই সবুজ আর বিপ্লব শব্দের প্রতিবাদ করতে যাবে? কিন্তু ফলত পর্যাপ্ত উৎপাদন থাকা সত্ত্বেও এখনো আমরা বিশ্বের মধ্যে ক্ষুধা ও অপুষ্টির অন্যতম খারাপ অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। আরো উৎপাদন আমাদের ক্ষুধা হতে মুক্তি দিচ্ছেনা বরং কৃষি সম্পর্কিত ব্যবসায় নিয়োজিত কর্পোরেশগুলোর পকেট ভারী করছে। একইভাবে, উচ্চফলশীল বীজগুলো মোটেও অধিক উৎপাদনশীল নয় বরং প্রচুর পরিমাণ রাসায়নিকের ব্যবহারের ফলে উচ্চ প্রতিক্রিয়াশীল।

ক্লাইমেট স্মার্ট কৃষি সবুজ বিপ্লবের মতই! আমাদের সচেতনতাকে ভোঁতা করে দেয়ার জন্যে একটি চতুর শব্দখেলা। আমাদের মূল্যবান শক্তি ও সম্পদ ব্যয় করে জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রক্রিয়া অনুসন্ধানের বদলে আমরা এখন এই সিএসএ নিয়ে আলোচনা ও প্রতিবাদ করেই আমাদের মূল্যবান সময়, সম্পদ নষ্ট করে চলেছি। প্রতিক্রিয়াশীল হবার বদলে আমাদের সক্রিয় হওয়া জরুরী। চলুন আমরা আমাদের নিজস্ব এজেন্ডা হাজির করতে শুরু করি। কৃষির শাসনের নিয়ন্ত্রণ ফেরত নিতে কৃষককে সহায়তা করুন, নিজেদের চাষাবাদের প্রভু তাঁদের নিজেদেরকে হতে দিন, যা তাঁরা আগে ছিলেন; তাঁদের জ্ঞানব্যবস্থাকে পুনস্থাপন করুন, যা তাঁদের

আগে ছিলো। কৃষকরাই ছিলেন মূলত বীজের মালিক, যাঁরা অবাধে বীজ অদলবদল করতেন। এখন বীজ ব্যবসায়ী কোম্পানীগুলো বীজ বেঁচে প্রচুর টাকা কামাচ্ছে এবং কৃষকদেরকে পর্যায়ক্রমে টাকা দিতে হচ্ছে বীজের জন্যে, যেটি তাঁদের ইনপুট খরচাপাতি বাড়াচ্ছে। যা ছিলো একটি মুক্ত সম্পদ, তা হয়ে গেছে বাজারি পণ্য। এতে কৃষকেরাই মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

প্রবন্ধঃ বাংলাদেশে জৈবকৃষিঃ অবস্থা, ইস্যু ও সম্ভাবনা

(অর্গানিক এগ্রিকালচার ইন বাংলাদেশঃ স্টেটাস, ইস্যুস অ্যান্ড প্রোসপেক্টস)

- ড. মো. খুরশীদ আলম, টিসিআরসি, বারি

মূলকথাঃ

রাসায়ানিক চাষাবাদের বিকল্প হিসেবে বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে অর্গানিক চাষাবাদের আবির্ভাব ঘটে। এটি একটি টেকসই চাষাবাদ পদ্ধতি। সাধারণভাবে,

ড. মো. খুরশীদ আলম

জৈব কৃষি এমন একটি উৎপাদন ব্যবস্থা যেটি সকল প্রকার কৃত্রিম সার, কীটনাশক, বৃদ্ধিনিয়ন্ত্রক এবং গবাদিপশুর এ্যাডিটিভসমূহকে এড়িয়ে চলে। সারা বিশ্বের বিভিন্ন সংগঠন জৈবকৃষির সাথে সংযুক্ত এবং অনেকেই একে অনেকভাবে সংজ্ঞায়িত করেন। জৈবকৃষি একটি সামগ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা যা জীববৈচিত্র্য ও জীবন চক্রসমূহসহ কৃষি-প্রতিবেশকে উৎসাহিত ও সংহত করে। জমির কার্বন নিষ্কাশন এবং গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণের প্রশ্নে প্রথাগত কৃষির তুলনায় জৈবকৃষির সুফল রয়েছে। মাটিতে কার্বন নিষ্কাশনের ক্ষমতার কারণে এটি গ্রিনহাউস ইফেক্ট এবং বৈশ্বিক উষ্ণায়নকে প্রশমিত করার ক্ষমতা রাখে! জৈবকৃষির অনেক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (উদাহরণস্বরূপ সর্বনিম্ন চাষ, ফসলের উদ্বৃত্তগুলোকে জমিতে ফেরত নেয়া, আচ্ছাদনকারী ফসলের ব্যবহার এবং আবর্তন, এবং নাইট্রোজেন-সংবন্ধক কলাই-মটরের বৃহত্তর সন্নিবেশ) মাটিতে কার্বনের প্রত্যাবর্তন বৃদ্ধি করেছে, যা মাটির উৎপাদনশীলতা এবং কার্বন ঘাটতি রোধে সহায়ক হয়েছে। অসংখ্য গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, জৈবকৃষির জমিগুলোতে মাটির জৈবকার্বনের পরিমাণ প্রণিধানযোগ্য হারে বেশি। মাটিতে যত বেশি জৈবকার্বন প্রত্যাবর্তিত হবে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমনে কৃষির ক্ষমতা ততই বাড়বে। জৈবকৃষি সারা পৃথিবীতে জনপ্রিয় হচ্ছে। সারাবিশ্বে জৈব খাবার উৎপাদন এবং জৈবখাদ্যের বাণিজ্য তাৎপর্যপূর্ণ হারে বাড়ছে। জৈব ব্যবস্থাপনাধীনে পরিচালিত কৃষি জমির আয়তনও দ্রুত বাড়ছে।

বাংলাদেশ একটি কৃষিনির্ভর দেশ এবং ১৯৬০ এর দশকের সবুজ বিপ্লবের আগে এর কৃষিব্যবস্থা জৈব পদ্ধতির ওপর ভিত্তি

করেই চলতো। ১৯৯০'র দশকের প্রারম্ভে ছোট পরিসরে জৈবকৃষির একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে বেশ কয়েকটি এনজিও এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এখন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কৃষক সমবায়ের আকারে কিছু প্রগতিশীল কৃষক এবং বেসরকারী উদ্যোক্তাগণ জৈবকৃষির চর্চা করছেন এবং তাঁদের পণ্যসমূহ একটা চুক্তিমূলক চাষপদ্ধতিতে আগোরা, মীনা বাজার, ও স্বপ্নের মত সুপার শপগুলোতে উচ্চ আয়ের ক্রেতাদের লক্ষ্য করে বিক্রি হচ্ছে। জৈবকৃষির সাথে যুক্ত বিভিন্ন এনজিও তাঁদের উৎপাদিত পণ্য তাঁদের নিজস্ব আউটলেটের মাধ্যমে বিক্রি করে। সম্প্রতি কিছু তরুণ উদ্যোক্তার মাধ্যমে জৈব পণ্যসমূহের অনলাইনভিত্তিক মার্কেটিং এর পত্তন হয়েছে। তাঁরা শহর অঞ্চলগুলোতে কমিউনিটি সমর্থিত কৃষিও অনুসরণ করছেন।

জৈবকৃষির সাথে জড়িত সমস্যাসমূহঃ

- জৈবকৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে বাংলাদেশের বেশিরভাগ কৃষকেরই সচেতনতার ঘাটতি রয়েছে।
- জনগণের মধ্যে প্রতিবেশ/বাস্তুসংস্থান সচেতনতা কম (প্রথমত গ্রামীণ জনগণের) এবং সর্বস্তরে কৃষিতে নিম্নমানের প্রযুক্তির ব্যবহার।
- ভোক্তার আস্থার ঘাটতি রয়েছে। যেহেতু প্রথাগত অন্য পণ্যের থেকে অর্গানিক পণ্যসমূহকে আলাদা করা যায়না, সেহেতু ক্রেতাকে অর্গানিক পণ্যের সপক্ষে উৎপাদক বা বিক্রেতাদের বয়ানের ওপরই নির্ভর করতে হয়। এখানে কোনও স্বীকৃত সনদদাতা প্রতিষ্ঠান নেই।
- বেশিরভাগ গ্রামীণ জনগণ গোবর ও ফসলের অবশিষ্টাংশ জ্বালানী হিসাবেই ব্যবহার করেন, যেটি পর্যায়ক্রমে ঐসব অঞ্চলে জৈব ইনপুটের ঘাটতি তৈরি করে।
- জৈব পণ্য উৎপাদকদের সংগঠন কিংবা কেন্দ্রের ঘাটতি। কোল্ড স্টোরেজ, ভ্যাকুয়াম প্যাকিং ইউনিট, প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটের মত অন্যান্য সুবিধাগুলোও অনুন্নত।
- জৈব পণ্যের বাজারজাতকরণ কৃষকদের জন্যে একটা বড় সমস্যা। অর্গানিক ব্যবস্থাপনা ও বিক্রয়ের সুযোগের ঘাটতি রয়েছে।
- প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা (গবেষণা, শিক্ষা, বিস্তৃতি) বাংলাদেশে তুলনামূলকভাবে দুর্বল।
- জৈব কৃষিতে প্রশিক্ষণ দেয়ার মত প্রতিষ্ঠান এখানে দুর্লভ।
- সামগ্রিক উৎপাদনে সাময়িক ঘাটতি অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধন করতে পারে।
- বিশেষ উদ্দেশ্যের মেশিন ও যন্ত্রপাতির ক্রয় অতিরিক্ত ব্যয়ের কারণ হতে পারে।
- কৃষি উৎপাদনে কোনও কার্যকরী ঝুঁকিবীমা ব্যবস্থা নাই। ভর্তুকি ও অর্থনৈতিক সহায়তার যথেষ্ঠ ঘাটতি রয়েছে।

জৈব সার প্রস্তুতের জন্যে আমাদের দেশে বিস্তর কাঁচামাল পাওয়া যায়। ফসল উৎপাদনের অন্যতম প্রধান উপাদান হচ্ছে পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা। অনেক ছোট কৃষকই এখনও স্থানীয় পদ্ধতিতেই পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ করেন (নিম, ছাই ইত্যাদি)। উদাহরণ হিসেবে, একটা বড় অংশের পোকামাকড় ও রোগবালাই নিমের উপজাতসমূহের (পাতা, ছাল) দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হয়, যেটি স্থানীয় আবহাওয়ায়, এমনকি শুষ্ক মৌসুমেও সহজেই জন্মায়। জৈবকৃষিতে নিমকে সর্বরোগের মহৌষধ গণ্য করা হয়, এবং এটি বাংলাদেশের জন্যে উপযোগী কেননা

নিম থেকে দরকারী রাসায়ানিকগুলো কোনও দামী এবং জটিল যন্ত্রের সহায়তা ছাড়া সহজেই সরানো যায়। আবার, জৈবকৃষি একটি শ্রমঘন উৎপাদনপ্রক্রিয়া। বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ, যেখানে সস্তায় শ্রম মেলে। উচ্চমুল্যের অর্গানিক পণ্য উৎপাদনে নিবিড় পরিচর্যার জন্যে এই শ্রমের পর্যাপ্ততাকে ব্যবহার করে বৈশ্বিক মানদণ্ড অর্জনের মাধ্যমে অধিক বৈদেশিক মুদ্রাও আয় করা সম্ভব।

প্রবন্ধের ওপর আলোচনা

ব্রি'র সাবেক পরিচালক ড. নিলুফার হাই করিম নীতিমালা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় কৃষকদের অংশগ্রহণের ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, কৌশলগতভাবে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় আমাদেরকে ক্লাইমেট স্মার্ট কৃষির বাস্তবিক ফলসমূহের ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপারে জাতিসংঘের মত আন্তর্জাতিক সংস্থার সুনির্দিষ্ট অনুসরণীয় নিয়ম থাকার কথাও বলেন তিনি। বাংলাদেশ জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা ড. মোর্শেদ আলম উল্লেখ করেন, কৃষিতে কৃষকের প্রয়োজনকে মাথায় রেখে সরকারকে ভূমিকা রাখতে হবে। ক্ষুধা এবং পুষ্টির মত লক্ষ্যাভিমুখী প্রয়াস জরুরী। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশে ক্লাইমেট স্মার্ট কৃষির ব্যাপারে বোঝাপড়ার ব্যপক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। মানুষের স্বাস্থ্যকে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে বেশি করে গুরুত্ব দেয়া জরুরী বলে তিনি মন্তব্য করেন।

নিখিল ভারত বন আন্দোলন ফোরামের সৌমিত্র ঘোষ বলেন, যেহেতু জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের কারণে হয়নি, সেহেতু সমাধানও আমরা তৈরি করতে পারবো না। সুতরাং, আমরা জলবায়ু পরিবর্তনে সক্রিয়ও হতে পারিনা। আবার এর সমাধানেও প্রতিক্রিয়াশীল কিংবা সক্রিয় হতে পারিনা। তিনি একটা স্মারক দেন যে, এখানে আমাদের করার মত কাজ খুবই অল্প। যত অর্গানিক পদ্ধতিতেই চাষাবাদ হোক আর প্রজাতিগুলোর সংরক্ষণই হোক না কেন, তিনি মনে করেন এটি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় যথেষ্ট নয়। কিছু নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের সাথে তিনি বিকল্প পথের

ড. সোহেলা আক্তার

ড. মোর্শেদ আলম

সৌমিত্র ঘোষ

ড. দেবল দেব

ওপরও জোর দেন। কৃষি সংশ্লিষ্ট সংঘাত মোকাবেলায় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর জোর দেন। সেশনের সভাপতি হিসেবে ড. দেবল দেব কিছু পয়েন্ট তুলে ধরেন। সেগুলো নিম্নরুপ:

- জলবায়ু পরিবর্তন শুধু আমাদের দ্বারা সৃষ্ট সমস্যা নয়। আমরা চরমসীমা অতিক্রম করেছি, যেখান থেকে জলবায়ুর যা ক্ষতি আমরা করেছি তা আর মুছে ফেলা সম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যদ্বাণি অনুসারে আগামী ৩০ বছরে জীবাশ্ম জ্বালানী শেষ হয়ে যাবে, তার

পরপরই মানুষ ও অন্যান্য প্রজাতির প্রাণির বিলুপ্তি ঘটবে। এটি একটি বাস্তব বিপর্যয়।

- এই বিষয়ে আমাদের রাজনৈতিক চিন্তা থাকা দরকার।
- অবস্থার উন্নতির জন্যে চিন্তাভাবনার পরিবর্তন, প্রকৃতির সাথে সংযোগ স্থাপন এবং পরিবর্তিত জীবিকা জরুরী।
- আমাদের প্রথাবদ্ধ এবং জীববৈচিত্র্যনির্ভর চাষাবাদের ওপর নির্ভর করা এবং চ্যালেঞ্জ গ্রহণের ব্যাপারে প্রস্তুত থাকা উচিৎ।
- কম মানুষের জন্যে বেশি উৎপাদনের পরিবর্তে আমাদের প্রয়োজন বেশি মানুষের জন্যে বেশি উৎপাদন।

অংশগ্রহণকারীদের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে একটি উন্মুক্ত আলোচনাও হয়েছে। এই আলোচনায় কিছু প্রতিক্রিয়া, প্রস্তাবনা এবং সুপারিশ দৃষ্টিগোচর হয়েছে যা নিম্নরূপ:

- কৃষিতে আরও বেশি মানুষকে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। সমাধান অন্বেষণে কৃষকদেরও সক্রিয় হবার ক্ষমতা প্রদান করা জরুরি।
- মুনাফামুখী বেসরকারীকরণের পেছনের ষড়যন্ত্রগুলো খুঁজে বের করতে হবে।
- পুষ্টি নিরাপত্তার লক্ষ্যে লবণজাত এবং ডুবুরি জাতের ফসলের পত্তন ঘটাতে হবে।
- সরকার, ভাগীদার এবং সংগঠনসমূহের উপযুক্ত সরবরাহ ব্যবস্থা জরুরি।
- যেহেতু জৈবখাদ্যে পরিপূর্ণ তদারকি সম্ভব নয়, সেহেতু সার্টিফিকেটদাতা সংস্থাগুলোকে উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আমাদের নজর দেয়া উচিৎ কৃষকদের সার্বভৌমত্বের প্রতি।

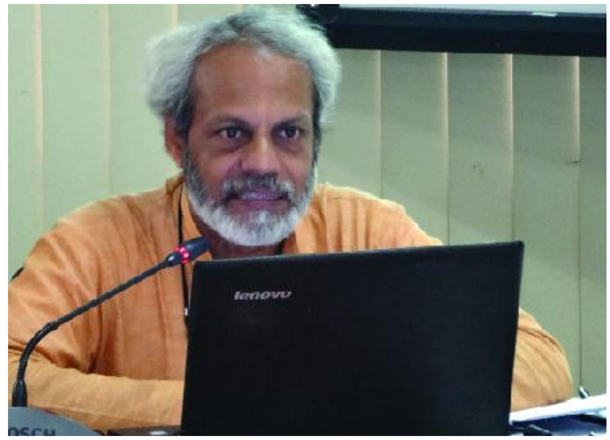

ড. দেবল দেব

প্রবন্ধ: সিএসএ'র কার্যকর বিকল্প

(দা ফাংশনাল অল্টারনেটিভ টু সিএসএ)

- ড. দেবল দেব, চেয়ার, সিআইএস, কোলকাতা

মূলকথা:

পরস্পরনির্ভর অজস্র প্রজাতির যে কোনও বাস্তুসংস্থানই সহনশীলতার বৃদ্ধি ঘটায়। এই গবেষণাপত্রে তিনি জীববৈচিত্র্য ও জৈবকৃষির গুরুত্বের উল্লেখ করে টেকসই কৃষির ওপর মনোনিবেশ করেন। সঠিক খাদ্য উৎপাদনে তিনি কৃষকের অংশগ্রহণকে অগ্রাধিকার দেন। তিনি বলেন, প্রকৃত স্মার্ট কৃষি হতে হবে সম্পূর্ণ অর্গানিক। তিনি বলেন, কৃষকদের উচিৎ বংশগত, বাস্তুতান্ত্রিক এবং প্রজাতিগত বৈচিত্র্যের ফসল ফলানো।

বৃহত্তর অর্থে ড. দেব দেখান যে, ধানচাষী কৃষকরাই পুনঃসংযোজন প্রক্রিয়ার ভোক্তা হতে চলেছেন। সুতরাং সকল ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আবশ্যক।

সহিষ্ণুতা: সংজ্ঞায়ন ও ব্যবস্থাপনা:

- মূল সাম্যাবস্থায় একটি ব্যবস্থার পুনরাধিষ্ঠানের সক্ষমতাই তার সহিষ্ণুতা।

- সহিষ্ণুতার পরিমাপ হচ্ছে প্রত্যাবর্তনকাল।

জটিলতাই সহিষ্ণুতার জনক:

- কমিউনিটি কার্যক্রমে কিছু বিশেষ আন্তক্রিয়াসূত্র (কিস্টোন, সর্বোচ্চ খাদক) সম্পন্ন প্রজাতির তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব রয়েছে।
- ব্যবস্থার সহিষ্ণুতা বৃদ্ধিতে কিস্টোন প্রজাতিসহ প্রজাতিগত বৈচিত্র্য গুরুত্বপুর্ণ।

পুষ্টির বাস্তব সমাধান শিল্পায়নের অনুকরণ করে আনা সম্ভব না। আমাদের অবশ্যই একে বদলাতে হবে এবং আমাদের নিজস্ব স্থানীয় খাদ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যেটি নতুন শহর-গ্রাম সংযোগ গড়ে তুলবে। এর ভিত্তি হবে কৃষক, জেলে, রাখাল, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, শহুরে কৃষক প্রভৃতি পেশাজীবির সত্যিকারের কৃষি-বাস্তুবিদ্যাগত খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা। আমরা কৃষি-বাস্তুবিদ্যাকে শিল্পনির্ভর খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থার হাতে ছেড়ে দিতে পারিনা। আমরা একে তার দরকারী বিকল্প হিসাবে দেখি। আমাদের মনোযোগ দিতে হবে যাতে আমাদের খাদ্য উৎপাদন ও ভোগের প্রক্রিয়াকে বদলানো যায় এবং জননী ধরিত্রীকে রক্ষা করা যায়।

প্রকৃত ক্লাইমেট স্মার্ট কৃষি:

- কৃষিবাস্তুবিদ্যা: শূন্য বাহ্যিক ইনপুট
- স্থানীয়ভাবে অভিযোজিত ফসলের বংশগত বৈচিত্র্য
- উৎপাদনের পুনঃস্থানীয়কায়ন
- বৈশ্বিক বাজারের নিয়ন্ত্রকদের থেকে স্বাধীন
- কৃষক ও জেলেদের বাজার
- গ্রামীণ জনপদগুলোতে কৃষক, জেলে, কারিগর এবং ভোক্তাদের পুনঃসংস্থান।

প্রান্তিক খামারগুলোতে লবণাক্ততা সহিষ্ণুতার জন্যে ধানের মূল্যবান স্থানীয় প্রজাতিসমূহ: গেটু, মতলা, তেল্যাগুল, সুরাকুরাভাই, কুন্দালি, কুজিভাদিছাই, কালহাকুনভালে, বেল্লাকুদাভাজা, কাল্লারুন্দাই, কাজ্জা।

খরা সহিষ্ণু জাত: স্বর্ণাবালী, কালু, সাম্বা, নিওচি, এন২২, ইরাবা পান্দি, কালামদন, পিছনি, ডেহুলা, রাঙি, হাইলা, কায়া, কেলাস, মাহাদী, পিছাভারী, দাবড়া, নানি-সাল, পাথারা, বেলচি।

বন্যা সহিষ্ণু জাত: জাব্রা, জলকামিনী, ঢুষার, কুদাইভাজাই, খাজারা, কুমারগড়, পান্তারা।

জলমগ্নতা সহিষ্ণু জাত: বাইশ-বিশ, চাকিয়া, পানিডুবা, বৈদেহী, কুড়কুড়াপ্পান, থাবালু।

শিফটিং চাষাবাদ হচ্ছে সবচাইতে টেকসই খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া। প্রথাগত শিফটিং চাষাবাদ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য:

- দীর্ঘ পতিতকরণ চক্র (>২০ বছর)
- মাতৃগাছের রক্ষণাবেক্ষণ
- আগুন নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি
- জৈবসারের প্রবর্ধিত ব্যবহার
- সমৃদ্ধকরণ বনায়ন

কৃষি-বাস্তুবিদ্যার প্রধান উপাদানসমূহ:

- শূন্য বাহ্যিক ইনপুট (বীজ, কৃষি রাসায়নিকসমূহ, জ্বালানী, বহিরাগত জীবসংস্থানসমূহ)
- জীববৈচিত্র্য সংহতকরণ- প্রজাতি, ভ্যারাইটি, বাস্তুসংস্থান
- সকল কার্যকর গ্রুপের রক্ষণাবেক্ষণ।
- স্থানীয় প্রয়োজনভিত্তিক উৎপাদন ও ভোগ
- স্থানীয় সংস্কৃতিসমূহের সন্নিবেশ (খাদ্যাভ্যাসসহ)
- লোকজ জ্ঞান এবং পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন
- গণমুখী তত্ত্বগুলোকে সংহতকরণ

ভারতে রাজ্য ও জেলা পর্যায়ের এবং মৌসুম অনুসারে উচ্চ-উৎপাদনশীল অঞ্চলসমূহে ধান উৎপাদনশীলতা বিশ্লেষণ থেকে ফলনে পতন, স্থবিরতা, ও মন্দা দেখা যায়।

অধিবেশন ৬ঃ বিকল্প কৃষি আন্দোলন ও চর্চাসমূহ

প্রবন্ধঃ প্রতিবেশগত কৃষিতে ফিরতে কৃষকেরা আগ্রহী তো?ঃ রিইবের বিশেষ কর্মসূচির অভিজ্ঞতা

(আর ফার্মারস্ উইলিং টু শিফট টু এগ্রোইকোলজি?ঃ এক্সপিরিয়েন্স অব রিইব ফ্রম দা স্পেশাল ইনিশিয়েটিভস্)

- ড. নিলুফার হাই করিম, ব্রি'র সাবেক পরিচালক

মূলকথাঃ

দেশে ২০৫০ সাল নাগাদ ২০.২ কোটি মানুষকে খাওয়ানোর জন্যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন হতে হবে ৩.৭৯ কোটি টন। বর্তমান কৃষি ব্যবস্থা ভীতিপ্রদ, কারণঃ

- সমানে রাসায়নিক সার, কীটনাশক, আগাছানাশকের ব্যবহার হচ্ছে
- ইনপুট সাপ্লাইয়ের জন্যে কৃষকরা বড় কর্পোরেটদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে
- স্বাস্থ্য ও পরিবেশের কোনও নিরাপত্তা নেই

রাসায়নিক চাষাবাদের প্রভাবঃ

- মাটির গঠন বিনাশ ও অনুর্বরতা বৃদ্ধি
- মাটির স্বাস্থ্য ও পরিবেশের বেহাল দশা
- উপকারী পোকামাকড় ও জীবসংস্থানগুলোর বিলুপ্তি
- একটি অস্থিতীশীল বাস্তুসংস্থান গড়ে তোলা
- দূষণ
- অচেনা অসুখ
- দুর্বোধ্য রোগব্যধিতে মৃত্যুর হার বৃদ্ধি

ফলে দেখা যাচ্ছে, একদিকে প্রচুর খাবার

ড. নিলুফার হাই করিম

পাওয়া যায়, কিন্তু অন্যদিকে সেগুলো নিরাপদ নয়। প্রতিবছর ৩.৫ শতাংশ হারে রাসায়নিকের ব্যবহার বাড়ছে!

প্রতিবেশগত কৃষি:

রিইবের বিশেষ অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, কৃষকরা প্রতিবেশগত/বাস্তুকৃষি বিদ্যা গ্রহণে আগ্রহ দেখাচ্ছে: সভাগুলোতে অংশ নিচ্ছে, জৈব চাষাবাদের চর্চায় নিয়োজিত হচ্ছে, কৃষকদের মধ্যে পুষ্টিসমৃদ্ধ পণ্যসমূহের প্রতি চাহিদা বাড়ছে, ফসলের জন্যে উপকারী জীবাণুগুলো সম্বন্ধে জানছে, এবং বাস্তুকৃষির সহায়ক প্রযুক্তি/পদ্ধতিগুলোকে গ্রহণ করছে। কৃষি পণ্যের ক্ষেত্রে দেখা যায়, এগুলোর বেশিরভাগই পরিবারে খাওয়া হয়, এবং বাকিগুলো কাছাকাছি বাজার কিংবা প্রতিবেশীদের কাছে বেঁচে দেয়া হয়।

বিশেষ কর্মসূচির অভিজ্ঞতা হলো, কৃষকরা বিকল্প চাষাবাদের পদ্ধতি হিসাবে বাস্তুকৃষি বিদ্যাকে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। তবে, কিছু প্রতিবন্ধকতার সমাধান প্রয়োজন:

- উৎপাদনবৃদ্ধি একটা চ্যালেঞ্জ। এর উপর পর্যবেক্ষণ এবং তদারকি দরকার।
- স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপকার নিশ্চিত করতে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারে আরও

ইকোসিস্টেম। উৎস: জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি ম্যানুয়াল, রিইব।

বেশি কারিগরি জ্ঞান ও পদ্ধতিগত চর্চার স্থায়ীত্বের প্রয়োজন।

। ক্ষুধা ও দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যে খাদ্য নিরাপত্তার সাথে সাথে পুষ্টির নিরাপত্তার বিষয়েও জোর দিতে হবে।

প্রবন্ধঃ নেপালের কৃষিতে পরিবর্তনের প্রভাবঃ কৃষকদের কৃষিই পৃথিবীকে শীলত করেঃ নেপালি কৃষকদের চোখে

(ক্লাইমেট চেঞ্জ ইন এগ্রিকালচার অব নেপালঃ পিজ্যান্টস্ এগ্রিকালচার কুলস্ দা প্লানেটঃ ফ্রম দা পারসপেকটিভস্ অব নেপাল'র পিজ্যান্টস্)

- প্রামেশ পোখারেল, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, অল নেপাল পিজ্যান্টস্ ফেডারেশন

মূলকথাঃ

নেপালসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমুহের অর্থনীতির মেরুদণ্ড ও জনগণের জীবিকার মূল উৎস হচ্ছে কৃষি। নেপালে ৬৬% মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল এবং জিডিপির এক তৃতীয়াংশ আসে কৃষি থেকে। কিন্তু কৃষি মূলত বর্ষানির্ভর এবং সারাবছর মোটে ২০% শতাংশ সেচ হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকই ছোট খামারি (>৬০%)। এখানে নারীরা গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখেন (প্রাচীনকাল থেকেই)।

নেপালে জলবায়ু পরিবর্তনঃ

। ১৯৭৫ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত ১২টি উষ্ণতম বছর (উদাহরণস্বরূপ ২০০৬ ছিলো উষ্ণতম বছর)।

। ওইসিডি (২০০৩) মতে, ২০৩০ সালের মধ্যে ১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে।

। নেপালে পনেরোটি হিমবাহ হ্রদ গলা বন্যার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

। আগাম অথবা বিলম্বিত বর্ষাকাল, অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত, বৃষ্টিপাতের দিনসংখ্যা কমে যাওয়া, প্রচুর বৃষ্টিপাত, বেশি বন্যা, এবং ভূগর্ভস্থ পানির কম প্রত্যাবর্তন।

। সম্প্রতি তরাই অঞ্চলে অতিরিক্ত কুয়াশার পরিস্থিতি দেখা গেছে।

। পাহাড়ি পরিবেশে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে তুষারপাত কমে যাওয়া এবং হিমবাহ অপসারণ।

কৃষিতে প্রভাব

। জৈষ্ঠ্য ও আষাঢ়ের প্রথাগত বৃষ্টি এখন শ্রাবণ-ভাদ্রে হয়। ধান উৎপাদনে এটি নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

। কৃষিতে এর প্রভাবে ছোট কৃষকরা সবচাইতে বেশি আক্রান্ত হয়েছেন এবং নভেম্বর থেকে এপ্রিলে কমে যাওয়া বৃষ্টিপাত মারাত্মকভাবে শীত ও বসন্তের ফসলকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

। কৃষি-বাস্তুতান্ত্রিক অঞ্চলসমূহে পরিবর্তন, প্রলম্বিত শুষ্ক মৌসুম এবং পোকামাকড় ও অসুখ বিসুখের মাত্রাতিরিক্ত উৎপাত পরিলক্ষিত হয়েছে।

। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অতিরিক্ত অগ্নিসংযোগের ঘটনা ৫০০০০ এর বেশি মানুষকে আক্রান্ত করেছে এবং একটা বিশাল উৎপাদনশীল বনভূমি বিনষ্ট করেছে।

সরকারের নীতিমালা ও কৌশলঃ

। জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমনকে উৎসাহিত করতে নেপাল সরকার জলবায়ু পরিবর্তন নীতিমালা, ২০১১ ঘোষণা করে।

। এর ইতিবাচক দিক হলো জলবায়ু

অভিযোজন এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কর্মসুচীগুলোতে নিচ থেকে ওপর অবধি অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা এবং সংবদ্ধ প্রয়াস, যেখানে গরীব

প্রামেশ পোখারেল

মানুষ, দলিত, প্রান্তিক ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী, নারী শিশু এবং তরুণ প্রজন্মের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়।

- স্থানীয় পর্যায়ে দারিদ্য হ্রাস ও জীবিকার ওপর লক্ষ্য রেখে ৮০% ফান্ড বরাদ্দ করা হয়েছে।
- জাতীয় উন্নয়ন এজেন্ডায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনকে মূলধারায় পরিণতকরণ।

অভিযোজনের স্বার্থে পদ্ধতি:

- বাস্তুতান্ত্রিক কৃষির প্রসার
- অভ্যন্তরীণ অভিযোজন (লোকজ জ্ঞানের ব্যবহার, স্থানীয় এবং আদিম ভ্যারাইটিসমূহ)
- জলজ সম্পদের সুরক্ষা: জলবেসিন ব্যবস্থাপনা
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা: প্রাকৃতিক দুর্যোগে সম্পদ ও জীবননাশা প্রভাবসমূহ প্রশমন, গ্রামীণ সমাজে তার নেতিবাচক প্রভাব ইত্যাদি প্রশমনের শক্তিশালী প্রোটোকলের কৌশলও প্রয়োগ করা
- কৃষি ও বনজ সম্পদ রক্ষা ও সংহতকরণ: খরাসহিষ্ণু জাতের ফসলের উন্নয়ন ও তার ওপর গবেষণা
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অপুষ্টি ও ক্ষুধা মোকাবেলা ও খাদ্যনিরাপত্তার উন্নয়ন সাধন
- প্রাকৃতিক সম্পদ ও বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণ: সংরক্ষিত অঞ্চলসমূহের চিহ্নিতকরণ, পুনঃস্থাপন, সংরক্ষণ ও সংযুক্তকরণ জীববৈচিত্র্য রক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

করণীয়:

- কৃষিকে তার কেন্দ্রীয় ভূমিকায় ফেরত নেয়া: খাদ্য সার্বভৌমত্ব অর্জন (বীজ সার্বভৌমত্ব ও কৃষিবাস্তুবিদ্যার চর্চা)
- জিএমও, সিন্থেটিক জীববিদ্যা, কৃষিজ্বালানী, সবুজ অর্থনীতির মাধ্যমে প্রকৃতির বাণিজ্যায়ন, কার্বন বাজার, জলবায়ু স্মার্ট কৃষির মত ভুয়া সমাধানগুলোকে প্রত্যাখ্যান করা এবং তার বিরুদ্ধে লড়াই করা
- বিভিন্ন পর্যায়ে পুঁজিবাদের বিকল্প নির্মাণ
- কৃষি-বাস্তুবিদ্যা প্রচারণা ও হস্তক্ষেপ
- জলবায়ু সুবিচার সংক্রান্ত আন্দোলনেক এগিয়ে নেওয়া

প্যানেল আলোচনা: কৃষিতে বিদ্যমান সমস্যা ও কৃষির ভবিষ্যত রূপ

কৃষিতে বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত করে সেগুলোর সমাধানে নির্দিষ্ট সুপারিশ করার জন্যে বিশেষ প্যানেলের আয়োজন করা হয়। এই প্যানেলের সভাপতি ছিলেন রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং-সাউদ এশিয়া'র প্রোগ্রাম ম্যানেজার বিনোদ কোস্টি। প্যানেলিস্ট হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের সদস্য ও রিইবের নির্বাহী পরিচালক ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা, কোলকাতা ভিত্তিক সিআইএস'র চেয়ার ড. দেবল দেব, ভারতের সেন্টার ফর টেকনোলজি অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট'র পরিচালক ড. রঘুনন্দন, এবং বাংলাদেশ জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সহযোগী পরিচালক ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম বলেন। উক্ত প্যানেল কর্তৃক চিহ্নিত সমস্যা ও সমাধানে সুপারিশসমূহ নিচে দেওয়া হলো।

ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা

বিনোদ কোস্টি

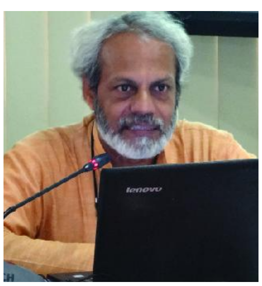
ড. দেবল দেব

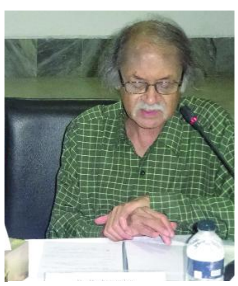
ড. রঘুনন্দন

ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম

সমস্যাসমূহ:

- চাষাবাদের প্রথাগত ও আদিম পদ্ধতিগুলো হারিয়ে গেছে।
- তৃণমূল আন্দোলনে জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষির জ্ঞানের অনুপস্থিতি।
- আমাদের পরিবেশ নীতিমালা আছে, কিন্তু আমাদের কোনও জলবায়ু সংক্রান্ত নীতিমালা নাই।
- উন্নয়ন অথবা খাদ্যনিরাপত্তার নামে কৃষিতে রাসায়নিকের যথেচ্ছ ব্যবহার।
- বহিরাগত প্রজাতিসমূহ ঘাতসহ স্থানীয় প্রজাতিসমূহকে ধ্বংস করছে।
- জিনগতভাবে পরিবর্তিত জীবের (জিএমও) ব্যবহার আশঙ্কাজনক।
- জলবায়ু পরিবর্তন ও জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষির নাম করে কৃষি প্রশমনে পশ্চিমা চাপ আশঙ্কাজনক।
- কৃষি অভিযোজনের প্রেক্ষিতে কৃষকদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান প্রাধান্য পাচ্ছে না।

সুপারিশসমূহ:

- কৃষি ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে জ্ঞানভিত্তিক প্রচার করতে হবে।
- একটি সুগঠিত জলবায়ু পরিবর্তন এজেন্ডা বিবেচনায় রাখতে হবে।
- কৃষি বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কিত সচেতনতা আরও ব্যাপকভাবে পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে হবে।

- জলবায়ুসহিষ্ণু বীজসমূহ ও তাদের জেনেটিক বৈচিত্র্যসমূহের যথাযথ সংগ্রহ ও বিতরণ দরকার।
- বংশগত বৈচিত্র্য রক্ষার প্রকৃত নিয়মসহ বীজ সংরক্ষণের পদ্ধতির ওপর ব্যপক প্রশিক্ষণ জরুরী।
- অংশগ্রহণমূলক কর্মকাণ্ড ও গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের অংশীদারকে জলবায়ুসহিষ্ণু কৃষিপদ্ধতি ও প্রযুক্তিতে উৎসাহিত করা এবং প্রচার করা।
- কৃষকের সামাজিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতার নিরীখেই জলবায়ুসহিষ্ণু কৃষিপদ্ধতির সমাধানকে এমনভাবে বাস্তবায়ন করা যাতে নেতিবাচক রাজনৈতিক অর্থনীতিকে মোকাবেলা করা যায়।
- জলবায়ুসহিষ্ণুতা, খাদ্যনিরাপত্তা, কৃষকের জীবিকা ও আয়, পরিবেশ, এবং ফসলের মান প্রভৃতিকে মাথায় রেখে বহুমুখী উদ্দেশ্যে কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ।
- জলবায়ুর প্রশমনে পশ্চিমা প্রভাব হ্রাসের দিকে নজর দিতে এবং নীতিমালা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে পারেন এমন জ্ঞানী কৃষকদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।

প্যানেল আলোচনার পরে একটি উন্মুক্ত আলোচনাও হয়েছে, যার কিছু প্রতিক্রিয়া, প্রস্তাবনা এবং সুপারিশ নিম্নরূপঃ

- স্থায়ীত্বের জন্যে কৃষি সংশ্লিষ্ট প্রবাদ, ছড়া, গান, গল্প এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গগুলোর সংরক্ষণ।
- টেকসই প্রকৃতির পক্ষে ধর্মীয় গল্পগুলো অনুসরণ করা যেতে পারে।
- সবুজ বিপ্লব অথবা জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষির মত পরিভাষাগুলো এবং তাদের রূপরেখা, অর্থ ও কার্যকরভাবে সাড়া দেয়ার ধরণের ওপর তথ্য-উপাত্ত জরুরী।
- কৃষির অগ্রগতিতে মোবাইল অথবা স্যাটেলাইট প্রযুক্তির বিশাল ব্যবহার সম্ভব।
- মাটির অবস্থা বিবেচনায় আনতে হবে।
- রায়ায়ানিক সারের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে ধিরে ধিরে জৈব সারের দিকে ঝুঁকতে হবে।
- কৃষক ও সংশ্লিষ্ট জনতাকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সংশ্লিষ্ট গবেষণায় সম্পৃক্ত করতে হবে।

প্যানেলের সভাপতি হিসেবে রোজা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং-সাউদ এশিয়া'র প্রোগ্রাম ম্যানেজার বিনোদ কোস্টি উল্লেখ করেন, আলোচকদের দেয়া বিকল্প ও পরামর্শসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের উচিৎ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতি সচেতন হওয়া। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট মহলের অংশগ্রহণে নীতিমালা প্রণয়ন এবং এর বাস্তবায়নে তদারকি বেশি জরুরী। তিনি আরো বলেন, রিইব ভবিষ্যতে চিন্তাশীল ও অভিজ্ঞ কৃষকদের সাথে সংঘবদ্ধ হতে পারে। নীতি নির্ধারকদের সংশ্লিষ্টতায় উপযুক্ত মডেল তৈরি, জ্ঞানভাণ্ডার, জ্ঞানের নিয়মিত হালনাগাদ ও তদারকির ওপর জোর দেয়া জরুরী।

অধিবেশন ৭ঃ সমাপনী

প্রবন্ধ ও আলোচনার সারমর্মঃ

তিন দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক এই সম্মেলনের শেষ দিনে সম্মেলনের উপস্থাপিত প্রবন্ধ ও আলোচনার সারমর্ম ও প্রস্তাবনাগুলো তুলে ধরেন প্রকল্প সমন্বয়ক মো: সাইদুর রহমান। প্রস্তাবনাগুলো নিম্নরূপঃ

মোঃ সাইদুর রহমান

- কৃষি খাতে ধ্বংসযজ্ঞ এড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় নীতি ও আইন অন্তর্ভূক্ত করা।
- কৃষি, ভূমি, জল ও সার নীতি বিষয়ক পর্যবেক্ষণ ও জটিল পর্যালোচনা অত্যাবশ্যক।
- নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকার, সিদ্ধান্ত প্রস্তুতকারক, সুধি সমাজ, কৃষক এবং সংশ্লিষ্ট জনগণের যৌথ কর্মসূচী প্রয়োজন। নারীদের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক।
- গবেষণার ফলাফল কৃষকদের কাছে পাঠানো আবশ্যক।
- বীজ গবেষণা, উৎপাদন, বিক্রয় এবং সামগ্রিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি স্বচ্ছ পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। জলবায়ু অভিযোজিত বীজের উপযুক্ত সংগ্রহ, বিতরণ এবং তাদের জিনগত বৈচিত্র্য বজায় রাখা দরকার। এসব বৈচিত্র্য ধরে রাখার প্রকৃত পদ্ধতিগুলো প্রসারে ব্যাপক কৃষি-পরিবেশগত এবং বীজ সংরক্ষণের পদ্ধতির

অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান

অধ্যাপক ড. যাকিয়া পারভিন

প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

- অধিক উৎপাদনশীলতা ও স্থিতিস্থাপকতার জন্য বিভিন্ন ধরণের উচ্চমানের বীজের শ্রেণীকরণ।
- সমগ্র কৃষি প্রক্রিয়াকে রাজনীতিকরণ করা।
- মাটি, পানি এবং বীজের সঠিক সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক করা। উপকূলীয় এলাকার মাটি রক্ষাসহ ঐ এলাকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- কৃষি বিষয়গুলোতে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- জলবায়ুভিত্তিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সরকারের সহযোগিতা নিশ্চিত করা।
- অধিক মাছ চাষের জন্য সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণ পদ্ধতি নিশ্চিত করা।
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বিকল্পগুলো খুঁজে বের করা এবং বাস্তবায়ন করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- টেকসই উন্নয়নের জন্য কৃষিতে বৈচিত্র্যের ধারনায় পরিবর্তন আনা।
- ভৌগলিক অবস্থান ভেদে বিশেষায়িত প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।
- পুষ্টি এবং খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করা প্রয়োজন।
- যথোপযুক্ত অভিযোজন এবং প্রশমনের জন্য নীতিগুলোকে টেকসই করা।
- জলবায়ু, প্রকৃতি ও কৃষি-প্রতিবেশ নিয়ে কৃষকদের মধ্যে সচেতনতামূলক কর্মসূচী শুরু করা প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তন এবং কৃষি বিষয়ক জ্ঞানভিত্তিক কর্মসূচী জোরদার করা।
- কৃষকদের সামাজিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতা এবং নেতিবাচক রাজনৈতিক অর্থনীতির অবস্থা মোকাবেলা করতে জলবায়ু সহিষ্ণু/স্থিতিস্থাপক কৃষি সমাধানগুলো চিহ্নিত করা।
- জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা, খাদ্য নিরাপত্তা, কৃষকের জীবিকা ও আয়, পরিবেশগত প্রভাব এবং জমির গুনমাণ নির্ধারণে লক্ষ্যে নানাবিধ পদ্ধতি আরোপ।
- কার্বন নির্গমন এবং শোষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ফসলের স্থায়িত্ব বজায় রাখা দরকার। এক্ষেত্রে দানা ফসলের উপর নির্ভরতা কমাতে হবে।
- পরিবেশের বিষয় মাথায় রেখেই সকল রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড নির্ধারণ করা প্রয়োজন।
- কৃষি ও পরিবেশের ক্ষেত্রে মুনাফানির্ভর ও ব্যক্তিগতকরণের ষড়যন্ত্র খুঁজে বের করা অপরিহার্য।
- তরল সারের বিকল্প হিসেবে বায়োচার ব্যবহার করা যেতে পারে, যেহেতু কৃষক নিজেই নতুন পদ্ধতির মাধ্যমে বায়োচার উৎপাদন করতে পারে।
- টেকসই উন্নয়নের জন্য বায়োফর্টিফাইড শস্য উৎপাদন দরকার।
- খাদ্যে সার্বভৌমত্ব অর্জনই মূল লক্ষ্য হবে, যেখানে সঠিক বন্টন ও সমন্বয় গুরুত্ব পাবে।
- বীজের বৈচিত্র্য ও গুণগতমান নিশ্চিত করতে হবে।
- কৃষি উন্নয়নে উপযুক্ত এবং সংশোধিত তথ্য-উপাত্তের প্রয়োজন।

। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলোকে গণমানুষের বোধগম্য করে তুলতে হবে।

বিশেষ ও প্রধান অতিথিদের মন্তব্য:

সমাপনী অধিবেশনে বিশেষ অতিথি হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান নিম্নোক্ত মতামত দেন:

। এই সম্মেলনে বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়গুলোতে আলোকপাত করা হয়েছে, যেটি প্রশংস-নীয়।

। জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর পদ্ধতিগত বৈজ্ঞানিক দিকগুলো যা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে সেগুলো নিয়ে আমাদের দেশে উদ্বেগ না থাকা আমাদের পশ্চাদপদতার একটি কারণ।

। এখানে বিজ্ঞান ভিত্তিক জ্ঞানের অনুপস্থিতি হতাশাজনক।

। আমাদের আরো অধিক মানুষের ক্ষমতা এবং প্রগতিশীল আর্থিকীকরণের সাথে প্রমাণভিত্তিক নীতিমালা প্রণয়ন পদ্ধতি দরকার।

। জাতীয় কৃষি নীতিতে লাভজনক কৃষিপন্থার বিষয়ে নজর দিতে হবে।

। অংশগ্রহণমূলক এবং প্রতিনিধিত্বমূলক নীতি গ্রহণ করতে হবে।

অধিবেশনের আরো একজন বিশেষ অতিথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা, পানি এবং পরিবেশ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. যাকিয়া পারভিনের সুপারিশ হল:

। জলবায়ু অভিযোজনের সাথে বৈচিত্র্যময় কৃষির উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা ও কাঠামো নির্মাণ প্রয়োজন।

। নতুন জাতের বীজ উৎপাদন এবং কীটনাশক ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন।

। কস্ট ইফেক্টিভ বায়োচার বীজের বিকাশ প্রয়োজন।

। কৃষিতে গবেষণায় বিনিয়োগ বাড়ানো দরকার।

। আঞ্চলিক প্রয়োজনীয়তা নিয়ে নীতি নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, সংসদ সদস্য জনাব মো: নজরুল ইসলাম বাবু, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও পদক্ষেপ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন এখন বিশ্বব্যাপী একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। বাংলাদেশও এর ফলশ্রুতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তিনি বিশ্বাস করেন যে, এই ধরনের সম্মেলনগুলোতে সরকারের কর্মকর্তারা অংশ নিয়ে আদতে কী কী ঘটছে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে পারেন, এবং বিশেষজ্ঞদের প্রস্তাবিত পদক্ষেপগুলো বিবেচনায় নিতে পারেন। সরকার কিভাবে সমস্যার মোকাবেলা করতে পারে সেসব নিয়েও ধারণা পেতে পারেন। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের সম্মানিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার সরকার এক্ষেত্রে উদ্বেগের সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। জলবায়ু গবেষণার ওপর সরকারের বাজেট রয়েছে এবং তিনি আলোচকদের তাদের আলোচনা, পরামর্শ ও সমাধানগুলো নিয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির সাথে পরামর্শ সভায় বসার আমন্ত্রণ জানান। তিনি এ বিষয়ে কাজ করতে সর্বক্ষেত্রে যথাযথ জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার বিষয়েও গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি আরো বলেন, কৃষকদের সহায়তা করতে ও কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে কাজ করতে বাস্তবসম্মত জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

মো: নজরুল ইসলাম বাবু

উপসংহার

ব্যাপক মাত্রায় কৃষকেরা কৃষিকাজ ছেড়ে দিলে আমরা আমাদের ভবিষ্যতের খাদ্যের লক্ষ্যমাত্রা পুরণে কোনভাবেই সক্ষম হব না। আমাদের বুঝতে হবে যে, আমাদের প্রয়োজন আরো অধিক মানুষের দ্বারা অধিক ফসল উৎপাদন, কম মানুষের দ্বারা অধিক উৎপাদন নয়। সবুজ বিপ্লব, জলবায়ুর পরিবর্তন ও আধুনিক কৃষির স্বরূপ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, জলবায়ু পরিবর্তন কোন পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই আবির্ভূত। শুধু প্রযুক্তিগত কর্মসূচি দিয়ে এর সমাধান সম্ভব নয়।

ঐতিহ্যগত জ্ঞান এবং মিশ্র ফসল চাষাবাদ খাদ্য সংকট সমাধানে ও প্রকৃতি সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় আঞ্চলিক বীজ এবং স্থানীয় ফসলের চাষাবাদ করা হলে সেটি খরা এবং বন্যা প্রতিরোধে ভূমিকা পালন করে। দীর্ঘমেয়াদী সমাধানে কৃষকদের কাজে লাগাতে হবে। কৃষি ক্ষেত্রের সমস্যার সমাধানে কৃষকদের নিজস্ব সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। আর এটা তখনই সম্ভব হবে যখন কৃষক কৃষিতে তার অবস্থান এবং নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে সক্ষম হবে।

বস্তুত কৃষিতে কৃষকদের অবস্থান পুনুরুদ্ধার করতে হবে। আর সেটি করতে সুশীল সমাজ এবং যারা কৃষি নিয়ে কাজ করছেন তাদের কৃষকদেরকে সহযোগিতা করতে হবে। এটা কৃষক তথা জনগনের খাদ্য সার্বভৌমত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সম্ভব হবে। কৃষিকে কেন্দ্রে রেখেই আমাদের সব চিন্তাভাবনা করতে হবে। কেবল জীবিকাভিত্তিক ইস্যু হিসেবে কৃষিকে গণ্য করা যাবেনা। কৃষককে এই পৃথীবীর প্রাচীন এবং আদি অনুশীলন বিজ্ঞানী হিসাবে স্বীকার করতে হবে, কারণ কৃষকেরা শুধু গ্রহণ করে না, বরং তারা পৃথীবিকে অনেক কিছুই প্রদান করে থাকে।

কৃষকদের জন্য কৃষিকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক করতে হবে। এজন্যে প্রথমে কৃষি এবং কৃষকদের মর্যাদা দিতে হবে। এক কথায়, পৃথিবীর আদি বিজ্ঞানী হিসেবে কৃষকের অবস্থান পুনরুদ্ধারে আমাদেরকে কৃষকের পাশে দাঁড়াতে হবে।

Research Initiatives, Bangladesh (RIB)

Research Initiatives, Bangladesh (RIB) was founded to promote knowledge on poverty alleviation that is relevant, innovative, participatory and action oriented, with a special focus on marginalized and socially excluded communities. RIB views poverty as a multidimensional process and recognizes that the needs of poverty groups go beyond simple income generation, food and shelter, to areas such as equality, dignity, justice, human rights and good governance. RIB supports marginalized and minority groups who are unable to access basic services due to social discrimination and conduct people's research ("Gonogobeshona") on the development schemes that affect them most, in order to develop ownership and generate community mobilization.

Rosa Luxemburg Stiftung

Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS) is a political foundation from Germany that works within the tradition of workers' and women's struggles. Bearing the name of Democratic Socialist Rosa Luxemburg (1871-1919), the foundation serves as a forum for debate and critical thinking about political alternatives, as well as a research centre for progressive social development. RLS promotes the discourse among activists, scientists and intellectuals from South Asia and Germany as well as from other regions of the world. A special focus lies on creating networks among countries of the Global South. The foundation also provides space for critical discourse and publishes educational material.

For more information please visit our website www.rosalux.in